নিবেদন

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'র একটা অংশ 'পূর্বখণ্ড'। এ-নামটা আমি কাব্যসমগ্রেই প্রথম ব্যবহার করলাম। সবচেয়ে আগের কবিতাগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এ-অংশের কিছু রচনা বর্জন করবার খুব ইচ্ছে আমার হয়েছিল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত আমি দমন করি। প্রকাশ-পদ্ধতির গতানুগতিকতা এবং মানস প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি আমার এই বিমুখতার কারণ। এরও আগে যে-সব কবিতা আমি লিখেছি এবং যাদের প্রায় সবই হারিয়ে গেছে তারা তাদের অপরিণতি সত্ত্বেও সংবেদনার অন্য সাড়ার কিঞ্চিৎ পরিচয় বোধহয় দিতে পারত। যে-কয়েকটা ছত্র বা স্তবক বিচ্ছিন্নভাবে স্মরণে আছে তা থেকে এই ধারণা হয়। সে যাই হোক, বর্জনের অভিপ্রায় আমি ত্যাগ করি এই ভেবে যে, পুরোনো এ-সব লেখা তো আমার চলারই এক সাক্ষ্য, তাদের কাছ থেকেই খানিকটা জানা যাবে আমার আরম্ভটা কেমন ছিল এবং তারপর আমি কোন্ দিকে চলেছিলাম। "প্রান্তরেখার" যে-সব কবিতা পরে লেখা তাদের ক্ষেত্রেও আমার বর্জনের ঝোঁক এসেছিল। মনে হয়েছিল যেন অন্ধের মতো চলা মাথাঠোকা এখানে-ওখানে। কিন্তু খেয়াল হয় আমার এই পথ-হাতড়ানোও তো সবার সামনে ধরা দরকার। নইলে কী ক'রে বোঝা যাবে আমার উত্তরণ, যদি আমি আমার একান্ত পথ পেয়ে গিয়ে থাকি?

এরপর কবিতাকে নিয়ে এক টালমাটাল আমার ভেতরে। ক্ষোভ, অসন্তোষ, অভিমান, ঔদাসীন্য, প্রতিরোধ। এবং বিরতি একসময়। সেই

অন্তে রচনাকালের উল্লেখ নির্দিষ্টভাবে করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতেও রচনার তারিখ লেখার অভ্যেস আমার নেই। সে-কারণেও সময় নির্দেশ সর্বত্র অভ্রান্ত হয় না।

"প্রান্তরেখা"র এই পরবর্তী অংশ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে ওঠে। এর কোথাও কি আমার ভাবনা ও বাক্‌রীতির কোনো স্বাতন্ত্র্য ফোটেনি ? এ-প্রশ্ন পাঠকদেরই বিবেচ্য। আমার শুধু মনে হয় (আত্মবিচার অবশ্য প্রায়ই প্রবঞ্চনা করে), এর অব্যবহিত পরের পর্ব থেকে অর্থাৎ 'উৎসের দিকে' থেকে একটা স্বতন্ত্র ধাঁচ আসে আমার কবিতায়, যার কিছু লক্ষণ প্রথম গ্রন্থে ছিল। তবে লেখক হিসেবে আমার মত তো এ-ব্যাপারে মান্য নয়। যাঁরা কবিতার স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম অনুরাগী তাঁরাই আসল বিচারক।

টালমাটালের পর আমি একাগ্রভাবে ফিরে আসি কবিতায়। বিভিন্ন গ্রন্থে আমার সেই যাত্রাপথ চিহ্নিত হয়েছে। আমি ক্রমশ কীভাবে অগ্রসর হয়েছি, কবিতায় আমি কী করেছি বা করতে পারিনি তা তারাই জানিয়ে দেবে। কাব্যসমগ্রের এই প্রথম খণ্ডে আংশিকভাবে তার নিদর্শন রইল; পরবর্তী খণ্ডে আরো থাকবে।

নিজের রচনা সম্বন্ধে অসন্তোষ আমার আজও ঘোচেনি, মনে হয় ঘুচবেও না কখনো। আমার চলা এখনো থেমে যায় নি। মস্তিষ্ক উৎসাহ দিলেও শরীর আর কতদিন অনুমতি দেবে জানি না। দেখা যাক, কাব্যযাত্রাপথের কোথায় গিয়ে আমি থামি অবশেষে।

অরুণ মিত্র।

সূচিপত্র

ঘনিষ্ঠ তাপ

মঞ্চের বাইরে মাটিতে

বেনামা সময়

প্রান্তরেখা

হে হৃদয়

আমার কুঠুরী 'পরে এক টুক্‌রা নীলে
আহ্নিক চক্রান্ত চলে। দিবসের চাঁদে
নিশান্ত তারায় সুর কখনো বা কাঁদে ;
রথচক্র-রেশ লাগে মেঘের মিছিলে
তারপর ; কল্পনায় হৃদয়ের মিলে
খুশী হয় হৈম দিন ; সমূহ প্রমাদে
ক্ষণিকে বিপ্রস্ত ঝরে জনশূন্য ছাদে ;
অরক্ষিত ছায়াপথ ভরে তিলে তিলে।

আশা-আশঙ্কায় জাগা খর অনুভব—
কম্বুরেখা ওঠে তার উর্ধ্বে অবিরাম ;
অভ্রলিহ চূড়া আজ, লেগেছে সেখানে
ঈগল নখরাঘাত, বিচ্ছিন্ন পল্লব
পাখসাটে উড়ে যায়, নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
হে হৃদয় মূল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে।

ইতিবৃত্ত

পদনখে উড়ায়েছি ধুলা।
হাটে মাঠে রাস্তায় গলিতে
সিহ্ শাল তমালের তলে
অস্বচ্ছ গৈরিক বৃত্ত ঘুরে ঘুরে লক্ষপাক।
উজ্জ্বল তির্যক রশ্মি ভেঙে গেছে ইন্দ্রধনু রঙে
বিভ্রান্ত দৃষ্টির পথে ;
ক্ষণপরে কুজ্ঝটিকা—ধুলার আড়াল পূর্ণচ্ছেদ।
কৌতুক-কাহিনী এই।
খণ্ড খণ্ড ভাগ্য যেন মহা ইতিহাস।

তোমাকে দিয়াছি উপহার
শহরের ইট-খসা কোঠার ভিতরে

গ্রামের কুটীরে
উদ্বেগে ঝীয়ানো আশা,
বহু আশাভঙ্গের আক্ষেপ;
তোমারও চোখের আগে আমার পায়ের
উড়ানো ধুলার ইন্দ্রজাল।

আশ্বিনের ঝড়
সঙ্গীন মুহূর্তে আসে,
নিশ্চিহ্নে তাড়ায় সব সূক্ষ্ম রেণু স্নায়ুতে কর্কশ।
উড়ায়ে দিলাম ঝড়ে আমাদের বিজয়-পতাকা।

রূপান্তর
সিঁদুর মেঘের রঙে ক্ষীণ সিঁথি ক্ষতরেখা
রক্তঝরা বেলা :
প্রহরী পাতার ব্যর্থ বিধুনন তৃণে লাগে,
লুব্ধ চোখ মেলা
জঙ্গলের জটলায় ; সহিষ্ণু প্রহর
ক্ষ'য়ে যায়, ক্ষ'য়ে যায় মর্মরের ঘর,
প্রাণান্ত প্রণয় শুধু নিশীথ আভাসে হবে
হয়তো বর্বর।

চূর্ণ কুন্তলের জালে ললাটিকা উল্কামুখী।
দক্ষিণ বাতাসে
আগুনের আঁচ লাগে ; গম্ভীর গানের রেশে
শ্লথ তৃষ্ণা ভাসে।
দিয়েছ বিদায় সদ্য গোধূলি-ধবল
শুকতারা—সন্ধ্যামণি তারা সুকোমল ;
অগ্নিবাষ্পে নবস্বাদ ওষ্ঠাধরে, স্বেদমুক্তা-
দীপ্ত করতল।

পুষ্পতন্ত্র টানিয়াছি ; দেখ না কি মাঝখানে
অসিধারা-সীমা ?
টঙ্কারে বেজেছে যত গত দিন মুহুর্মুহু,
তাদের মহিমা
মিলায় যে চক্রবালে ; আরেক আকাশ
স্পন্দমান ; শুষ্কপত্র শাখার বিন্যাস
বায়ুস্তরে ; লাল ফুল স্তবকে স্তবকে খালি
এনেছে উচ্ছ্বাস।

চকিত আলো

জ্বলন্ত মশালমুখ বিঁধিয়াছে অপরাহ্ন
বিহ্বল গুহায়।
আলোর ঝলক লাগে—কর্কশ হাতের শিরা,
মনিবন্ধটুকু,
পাঁজরের ওঠানামা. দক্ষিণ উরুতে টান,
তির্যক ভুরুর
ভগ্ন রেখা—চিত্রময় শূন্যতল। রাজধানী
ভুলিয়াছে কথা।

এখন যে বিরামের সুরভি সময় ছিল
নিত্য নিয়মিত,
এখন যে উষ্ণ স্নায়ু মধ্যাহ্নের স্তূপ ঠেলে
পুরানো অভ্যাসে
বাতাসে জুড়ানো যেত। অস্তাচলে নিদ্রালীন
মিড়ে বাজিবার,
দ্বারপ্রান্তে ছুটি পেয়ে বাজিবার তন্ত্রী যত
কাল্পনিক সব।

দ্বারে দ্বারে খুঁজে ফেরে করধৃত দৃপ্ত শিখা,
বিগলিত নভ.

সমস্ত নখের সারি ফুটিয়াছে দূরান্তের
তারকারা যেন—
কোথায় উদগ্র চোখ নিষ্পলক চেয়ে আছে
রাত্রির সীমায়।
চকিত আলোকে ঝলে পাঁজরের ওঠানামা,
মনিবন্ধটুকু।

সৈকত

কটি-মেখলায় বৃথা বাজিয়াছে বিলম্বিত তাল,
তরঙ্গের করতালি ভুলে যাও। সিক্ত সিকতায়
মারাত্মক পদচিহ্ন; সঙ্কুচিত সমুদ্র বিশাল।

নৌকাবিহারের পালা শিশুমুখ ঢেউয়ের খেলায়
এতক্ষণে ভুলেছ কি? বক্ষের আবেগ-সঞ্চার
উৎক্ষিপ্ত শীকরে আর আগন্তুক ইস্পাত-ভেলায়।

রৌদ্রালোকে বালুকণা হীরাজলা, জ্যোৎস্নার বাহার
বিগলিত উপকূলে, নারিকেল মাথার ঝালর—
সুবিস্তৃত পটভূমি ছবিতেই মানাবে এবার।

জাহাজের ভগ্ন খণ্ড ভাসমান, জলের কবর
অলক্ষিত; মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট ছত্রভঙ্গ শব
তীরে ভেড়ে; প্রাণ কেড়ে সঞ্জীবিত নির্জন সাগর।

কলরোলে তালভঙ্গ, বহমান নৃত্যের পরব
সাঙ্গ হল ভ্রান্ত লয়ে। প্রসারিত রূঢ় প্রহরণে
ক্ষিপ্র গতি ছন্দহীন। উপকূলে নূতন উৎসব।

যতই ঝরুক অশ্রু, হারাবে তা সমুদ্র-লবণে।

বন্দী

শৌখীন ছায়া যবনিকা টানে দীর্ঘতর।
তবু ভ্রমণ অচল তবে ?
দীর্ণ সময় পালক ছড়ায় প্রতিক্ষণে,
ফেননিভ ছোঁয়া শয্যা ছেয়ে।
আঙুলে আঙুলে রক্তিম ছিল কী আগ্রহ—
সে-আদিপর্ব লুপ্ত কবে !
শীতল শিরায় ঘুম আনা সোজা দু-চোখ যত
হবে অসহায় সামনে চেয়ে।

বহ্ন্যুৎসব কই ভোলা যায় অসঙ্কোচে ?
স্ফুলিঙ্গ তার উড়ছে কোনো
দখিনা হাওয়ায় জানলার ধারে হয়তো কোনো
ঝোড়ো কুন্তলে তারার মতো।
লঘু আশ্রয়-বিলাসী প্রণয় নিরুদ্দেশে
হৃদয়কে চায়, জড়ায় মনও—
বিদ্রোহী স্মৃতি পটভূমিকায় আগুন আঁকে,
লাল আভা কাঁপে ইতস্তত।

অপঘাত চাওয়া বিদ্যুতে সেই পাহাড়-পথে
সফল হল কি আলিঙ্গনে ?
দুঃসহ পদশব্দ না থাক এখন কানে,
চমকায় দীপ সঙ্গোপনে।

দোটানা

ঘূর্ণিত পতন আছে আশেপাশে যোজন-গভীরে,
অসম্ভব অভিপ্রায় দোলায় শিকড়-ফাটা মাটি,
দ্বিখণ্ডিত রশ্মি হায়-নিরুদ্দিষ্ট দিগন্ত-সমীরে।

বঙ্কিম সে-বিগ্রহের পুড়ে পুড়ে হয়েছে কি খাঁটি ?
দীর্ঘশ্বাসে তীক্ষ্ণ ধার, কলঙ্ক পড়েছে সাদা চাঁদে ;
ঊর্ধ্বরেখা স্বচ্ছতর, স্বচ্ছতর মনের কথাটি ।

দু-বাহু ঘেরাও করে বারবার অভ্যস্ত আহ্লাদে
সোনার হরিণ আর স্মরণের বিপর্যস্ত সোনা,
দু-হাতে পাথর-কাটা কঠিন কাঠামো বুঝি বাধে ।

হৃদয়ের আন্দোলন ঘড়ির কাঁটায় যায় শোনা ।

মোহ

ক্রুর ভ্রূকুটি পর্বতপ্রমাণ হল—
বিদ্বেষের ইঙ্গিত কাল
অসংযত ।

আমাদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে ।
তবু আশ্চর্য লাগে—
রাস্তায় সেদিনকার পায়ের ছাপ
এখনো রহস্যময়,
গলিত প্রাসাদের গাম্ভীর্য
কী গভীর এখনো ।
পিছন ফিরে তাকাই—
প্রগল্‌ভ লগ্ন কতদূর !
উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষার আড়ালে তো ছিল মূর্ছা,
খণ্ডবিখণ্ড জঘন্য তৃপ্তি ।

মোড়ে মোড়ে চকে
ব্যগ্র অসংখ্য নিশান ।
ওরা যেন ডাকে
সেদিনকার ক্যাকাশে প্রিয় মুখগুলোকে ।
আশ্চর্য লাগে ।

প্রবাস

সমুদ্র-পৃষ্ঠের বেড় ছাড়ালাম নিচে দূর নিচে—
তুষারের মায়াবী সীমানা
শৃঙ্গচর।
মেঘলোকে
কোন্ রাজ্য আবিষ্কার ?
শোচনীয় সমতল ভুলে যাওয়া যাবে।
ঘন পত্র-সন্নিবেশে কতকাল ধ'রে
অভ্যর্থনা—
সমতল স্বপ্নহর এখানে বিস্মৃত।

পাহাড়ে ফসল ফলে।
পাথুরে মাটিতে থাকে থাকে
অবরোহী ক্ষেতের বিথার।
উত্তর প্রান্তের শীতে ঘাম ঝ'রে গেছে
উদ্ভিদ লালনে।
তুহিনে ঝাঁঝালো রোদে চারাগাছে প্রাণের আবেগ
(প্রাতরাশে অপূর্ব নির্যাস) ;
বাগিচার তুলনা বিরল।
বসতি বিরল হল আবাদের ক্ষিপ্র ইন্দ্রজালে।

এখানে শহর।
চেনা মানুষের ডেরা
দূরগত স্মৃতি ঘেরা
জমাট শহর।
উদ্ভিন্ন পর্বতচূড়া সন্তর্পণে রহস্য জমায় ;
তখনো হোটেলে বাল্‌ব জলে।
পিচ-ঢালা সর্পিল রাস্তায়
মোটরের হর্ন বাজে,
উপত্যকায় ঘোরে প্রতিধ্বনি · প্রতিধ্বনি ;
আর থাকে থাকে

আলো বিঁধে কুয়াশার
অতল শিহর।
তারপর হোটেলে আরাম,
তারপর চেনা মুখ, প্রাসাদের ভিড়, পদভরে কম্পিত মেদিনী।

পাহাড়ের সন্ততিরা শশব্যস্ত—
এক ফোঁটা জমি যদি পায়
বাসা বানাবার
এমন আকাঙ্ক্ষা যারা পোষে।
হিমগিরি ধ্যানাতুর,
যোজন যোজন জমি উর্বর আবাদে গেছে ছেয়ে।

*

এখানে এবার নাই বরফের মোহ,
চড়াই এলাকা খালি ;
বনগিরিমাঠ স্বপ্ন দেখায় সেধে,
সুদূর গৃহস্থালি।
পৃথিবী অসীম—ধাবমান ধূমকেতু
অধিত্যকায় হয়তো নিখোঁজ হবে,
পরম যত্নে বাঁধা শড়কের সেতু
পার হয়ে চলো, চলো কোনোদিকে অবাধ।

দিক্‌জয়ী পথ চারিদিকে আছে পাতা,
নদীতীরে কাছাকাছি
বাঘের থাবার ছাপ লাগে অতি মৃদু—
অধীর সব্যসাচী।
শিকারীর দল। আর কারা রাস্তায় ?
রেঙ্গুনে চায় ছ'মাহিনা ভর কাজ—
খনি-খামারের দেশ কি দেয় বিদায় ?
শিকার—শিকার—বনভূমি পদদলন।

এই পথ গেল পাহাড়ের পিঠ বেয়ে—
অশ্বোতরঙ্গে নেশা—

তারপর ঘুম চলতিপথেই ছোটে,
আঁখি-বিস্ফারে মেশা

দুর্লভ জ্ঞান : এখন লড়াই চলে
রাস্তায় রাস্তায়। জঙ্গী আমেজে ভারি
অরণ্যপথ, নিভৃত কৌশলে
ইমারত ওঠে—ব্যারাক বন্দিশিবির।

প্রতিক্রিয়া

মিথ্যুক মুখের বিষে সহজেই বাঁকো,
অপঘাতে সায় থাকে বিচ্ছিন্ন মনের।
অভ্যাসে নিলক্ষ্য দিন, প্রাত্যহিক জের
টেনে যাওয়া ; অনায়াসে জমে লাখো লাখো
বিশৃঙ্খল অভিযোগ। নেই কোনো ফাঁকও
সাজানো মেঘের স্তূপে, সকাল সাঁঝের
মাঝখানে বরাবর পথ পাবে টের
পরিচিত পদক্ষেপে, উধাও সে-সাঁকো।

এই শেষ নির্বাসন। এখনো দুরাশা
কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই ক্ষণ-জীবিকায় ?
দিগ্বিজয়ী কাল আজো হয়নিক' জানা।
কল্পিত কাহিনী শোনো ; অসংযত ভাষা
দিকভ্রান্তি আনে মিছে, আর অসহায়
মেনে চলা ক্রমাগত আশে পাশে মানা।

ভূমিকা

প্রান্তরে কোনো আলেয়া কোথাও গিয়েছে নিভে—
অস্থির দিন এসেছে বুঝি,
স্বপ্ন-শহর চূর্ণ তারায় ছিটিয়ে দিয়ে
রৌদ্রের ডাক হঠাৎ এল।
বেলায় বেলায় ধারালো সময় আসে,

স্টীলের কুঠিতে কঠোর পরিক্রমা,
নগণ্য রাত তন্দ্রায় গেল মুছে,
আজ ইতিহাস শিথিলস্মৃতি।

পিছনে ছড়ানো মজুর ভিড় জমাট বাঁধে,
মিছিল মিলেছে জনস্রোতে,
ঘনিষ্ঠ মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত,
ফাটলে ফাটলে ছায়ারা ভোবে।
আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে,
নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে,
পায়ের তলায় দ্রুততম হল যেন
বহু দিনকার উধাও গতি।

ভাগ্যের সীমা খড়্গের মতো আসন্ন কি?
প্রস্তুতি আজ সমুদ্যত;
তীক্ষ্ণ বাঁশিতে সুর কেটে গেছে সকালবেলা—
রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো।
সংহত বেগ ঘন সঙ্কটে চাপা;
উড়ন্ত ধুলো কালো মেঘ হবে নাকি?
নিভৃতি চাঁদের মমতা তো নেই মনে,
অন্তরায়ণে দিনের শুরু।

যুদ্ধবিরতি

ঘুম মানায় না তোমাকে এখন।
কত সূর্য-অভিশপ্ত রাত
পার হয়ে এসেছি আমরা,
কত বিনিদ্র পল-বিপল।
সমুদ্র কেঁদেছে আমাদের পায়ে পায়ে
বালি-মাখানো অন্ধকারে;
মরুভূমি তৃষ্ণার্ত;
আর অতর্কিত মৃত্যু-খচিত বনস্থলীর আর্তনাদ আমাদের ঘিরে।

পার হয়ে এসেছি আমরা
সময়ের উড্ডীন পাখায়
বহু দুর্বহ ভগ্নাংশ-মুহূর্ত।
এখন ঘুম তোমাকে মানায় না।

তোমার দৃষ্টির মানে আমি বুঝি :
যুদ্ধবিরতির আস্বাদ লেগেছে তোমার চোখে ;
সমস্ত অতিক্রান্ত অন্ধকার তোমার স্নায়ুতে সঞ্চিত.
তুমি শিথিল।
তবু ঘুম তোমাকে মানায় না,
এই তো বাসর।

এবার
কঙ্কালমুঠি বাড়াও।
নির্বোধ দ্বিধা—দাবানলে ছাখো
অরণ্য যায় পুড়ে।
পাতা-ঝরা গান নেই আর পথ জুড়ে।

চোখের মণিতে সে-মরীচিকার ছায়া
মোছেনি কাঁকর বিঁধে ?
কুহকী সূর্য বিকল নভশ্চর ;
এতদিনকার বিষণ্ণ হাসি
এবার অবান্তর।

হাড়ের ভেল্কি লাগুক বিসংবাদে।

জঠর
আমরা পৌছেছি এসে নানা দিক থেকে
প্রখর প্রান্তের কাছে।
বিবিধ জল্পনা ক্ষান্ত ক'রে

ক্লান্ত চোখে আশা জেলে
এগিয়ে এলাম এতদূর।
এখন সূচ্যগ্র লক্ষ্যে আমরা সকলে হব স্থির।

প্রাচীন বণিক ফেরে অন্তিম দাপটে
ঘরে ঘরে,
অন্ধ সদাগর
সশস্ত্র তাগিদ দেয় দ্বারে,
মাঝখানে ছিনিমিনি অন্ন গেল উড়ে
উপোসী গ্রাসের আগে।

এ নিরন্ন রাজ্যের সীমায়
দুর্জয় মিলনে মরি বাঁচি।
ভুখমিছিলের সামনে শুধু
সূচ্যগ্র লক্ষ্যের বিঁধ।

আমাদের ইতিহাসে চিহ্ন দিক
ক্ষুধিত জঠর।

পারিপার্শ্বিক

এই সব রক্তবীজ।
লোহাতে লাগল দাগ, মুষ্টিমেয় সোনায় ছোঁয়াচ;
মসৃণ সম্পদে এল বিপদের স্বাদ।
উদ্বিগ্ন আশায় জাগা, ভয় পেয়ে ভুলোবার ছাঁচ
নানা ছাঁদে গড়া, মিথ্যে ছড়ানো সংবাদ।
স্বৈরাচারে স্বস্তি কই বলো?

পরিত্যক্ত আবেদন।
ফাঁকা সন্ধ্যা ঘুরে মরে, অন্তঃপুরে পূর্ণচ্ছেদ টানা;
বিদায়ী বসন্ত কারো আনেনি বিরহ;

বিবচক্র আবর্তনে অনুযোগ রয়েছে অজানা ;
চাপা পড়ে নীড় আর সে-নীড়ের মোহ।
খড়কুটো উড়ে গেল কবে।

দরদী প্রচার শেষ।
মুখোস খুলেছ তবু ভরসায় নোঙর কোথায় ?
সংক্রমণ ছড়ায় যে দণ্ডধর বাহু।
যে-আত্মপ্রসাদ ছিল নির্বিচার অস্ত্রের ফলায়
তারও রেশ মোছে কোন্ রাহু ?

রক্তবীজ ছিটাল ইঙ্গিত।

উৎসর

মুক্ত কৃপাণে কুয়াশা কাটে ;
দেওয়ালে জটিল ছায়া
দ্রুত পলাতক ; ফাটা কপাটে
ঢাকে না পুরানো মায়া।

গহ্বরে টান পিছন থেকে—
মন্থিত সংবিৎ,
সম্মুখে কোন্ পাষাণ ঠেকে
টলে অথর্ব ভিত।

বিস্তৃত পট : অকস্মাৎই
উপান্ত যায় দেখা ;
যবনিকাপাত : ক্লান্ত বাতি
শেষ চিহ্ন যে একা।

নির্মূল পদচারণ-প্রীতি—
থর ধ্বজা উড্ডীন ;
চূড়ান্ত স্রোতে মগ্ন বীথি ;
প্রত্যূষ সঙ্গীন।

উত্তরমেঘ

ছোট ঘর ঘিরে মেঘাড়ম্বর নিরন্তর।
রূপকথা হবে জীবন্ত, এই আশা তোমার।
ভাঙা পালঙ্কে সোনার কাঠির মৃদু পরশ
অঝোর শ্রাবণে লাগে যদি আহা লাগেই আজ।

দুয়ার দিলাম সন্তর্পণে : চতুর্দিক
কাছাকাছি আসে, গাঢ় হতে চায় বিনা কথায় ;
আর দেখি হায় তোমার নয়নে দিবাস্বপন।
মুখ গুঁজে থেকে প্রতীক্ষা করে কক্ষকোণ।

মেঘ-পর্বত বাহিয়ে তুলেছে শ্যাম শিখর।
জান্‌লায় চেয়ে ভাখো অলকার গৃহ অলীক ;
মৌসুমী বায়ু কখনো পাগল, দূরাগতের
হাহাকার বেঁধে ভিতরের ছাদে বারংবার।

ঘোর ভ্রূ-ভঙ্গ তোমার, বিঘ্ন দুঃসহন ;
ছোট্ট একটি বাতায়ন আনে শত বেতাল।
ভুজবল্লরী বাড়ালে. বন্ধ করো কি তাও?
তবে নিঃশ্বাস নেবার কী হবে, কোন্ উপায়?

বিড়ম্বনা

শেষ বর্ষায় মরা গাঙে দেখি এল প্লাবন।
আজ যে তোমার অধরে হাসির ভরা জোয়ার ;
গ্রীষ্মের জ্বালা বিছানো যে-মুখে প্রতি রেখায়
ফুটল সেখানে ঘন আনন্দ রসমধুর।

বহুকাল পরে প্রথম প্রেমের লাগে আমেজ,
নব অনুরাগে তোমার শরীর লীলাকমল,

এখানে আজ অভ্যর্থনা রবাহূতের,
কলকাকলিতে ভরালে ঘরের চাপা বাতাস।

এই যে আমার কণ্ঠে জড়ালে কর-ভূষণ,
আমি যেন দিগ্বিজয়ী, আমায় পারিতোষিক
দিলে বাহুমালা। অতলস্পর্শ মায়া তোমার:
আশ্লেষে দিতে চাও অতীতের ক্ষতিপূরণ।

গভীর তোমার ফল্গু-প্রেমের ধারা উছল,
ধন্য আমার দীর্ঘ বেকার দশা-মোচন।
পাগলা বাঁশিতে চমকাও কেন? করা কী আর?
এলো যে বোমারু, নিচের তলায় চলো পালাই।

একটি নিবেদন

স্বর্ণ হাসির তীর বেঁধাও দেওয়ালে
ঝাঁকে ঝাঁকে, তারা সব ভোঁতা হয়ে ঝরে।
তূণ কেন শূন্য করো? পোষাবে না পরে
এতখানি মেহনত। এবার কপালে
চমৎকার ভাগ্যলিপি লিখেছে সরকার:
অন্নবস্ত্র নিরুদ্দিষ্ট, হয়তো গ্রেপ্তার।

সেই নগ্ন দিনের খাতিরে
কিছু বাণ থাক না তূণীরে।

ভাষণ

লাল ইস্তাহার

প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো।
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ,
ভোঁতা হয়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)

যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো
নতুন ইস্তাহার।

ভিড়ে ভিড়ে খোঁজো. ফৌজ আছে তৈয়ার,
প্রস্তুত হাতিয়ার।
শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া
দেব্‌তারা পারে ঠেকাতে আর কি বলো ?
শৃঙ্খলে এল সৈনিক-শৃঙ্খলা,
উঁচু কপালের কিরীট যে টলোমলো।

নিঃশ্বাস চাই, হাওয়া চাই, আরো হাওয়া।
এই হাওয়া যাবে উড়ে—
দেব্‌তারা সাবধানী—
ঘোরালো ধোঁয়ায় ছাপাবে অন্ধকার,
মানুষেরা, হুঁশিয়ার !

ঘরের জান্‌লা হয়তো বিপদ ডাকে ;
মর্‌চে-ধরা ও ঝিমোনো গরাদেগুলো
গোপন রেখেছে আব্‌ছা গারদ নাকি ?
ঘরের মানুষ, মৃত রাত নয় ভুলো।

প্রাচীরপত্রে অক্ষত অক্ষর
তাজা কথা কয়, শোনো ;
কখন আকাশে ভ্রূকুটি হয় প্রখর
এখন প্রহর গোনো।
উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার ;
দেব্‌তার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো ;
মানুষেরা, হুঁশিয়ার !

লাল অক্ষরে লট্‌কানো আছে ভাখো
নতুন ইস্তাহার।

সামরিক

সামরিক দিনে টলেনি সেনা।
নেহাইতে-পেটা কত ইস্পাতে ঝলক লেগে
জ্বলে আকাশ ;
অভ্রফলকে মুখ দেখা যায়—আগামীকাল
ঝুঁকে তাকায়।

শস্যক্ষেতের গান ছিল শুনি, বধির মাটি
শোনেনি সে-সুর স্মরণকালে,
আষাঢ়ে গল্প চাষারা শুনেছে সম্প্রতিও,
সেনানীর পদপাতে আজ নব প্রতিশ্রুতি।

ধ্বংসাবশেষ পেশীরা সেদিনও ফসলভারে
অপমৃত্যুকে টেনেছে কাছে ;
পাথুরে শহরে হাতড়ানো ভোর চেয়েছে বৃথা
শেষ রাতটুকু—গাঢ় আড়াল—
জীবিকা রেখেছে সীমানা গেঁথে
নির্বিকার।
দুর্গপ্রাকারে প্রহরা বিধাতা বাণী শোনায়
মোটা মুনাফার বেতনভুক ,
পিছমোড়া হাত প্রণামী গুণ্‌বে—জন্মগত
সে-অধিকার।

ম্লান ইতিহাস পাতা ওল্‌টায় বর্তমানে।
হল সমাপ্ত ব্যূহরচনা ?
সামরিক দিনে সম্মুখ দলে অগ্রগতি,
রক্তের বেগ কী উৎসাহী !

মাঠকারখানা মেখে আকাশ,
অন্ত্রফলকে প্রতিফলন,
আগামীকাল
ঝুঁকে তাকায়।

মাটির কবর

আহত ডানার মতো মাটির স্পন্দন—
ব্যাধ-বন্দী আতঙ্ক সেখানে।
বিস্ফোরণ-বিদীর্ণ গহ্বরে
মুহূর্তে পড়েছে খ'সে খণ্ডিত আকাশ,
মাঠের নিঃশ্বাস গেছে বুঁজে,
নিভেছে নগর।

আগন্তুক সর্বনাশে মহাদেশ সমুদ্র-উদ্বেল।
কোটি কোটি পদক্ষেপে দিগন্ত কুহেলি,
কোটি কোটি জানু আর বাহুর ঝাপটে
চমকায় ছায়া ;
পীত হিংসা কী অমোঘ
বারুদের শিকারী আলোয়।

স্ফুলিঙ্গ-স্ফুরিত নিশা
প্রতিরোধী মনে
বিকীর্ণ করেছে কোন্ সংকল্পের বীজ
ওরা তা কি জানে ?

যদি বা পাণ্ডুর চাঁদ পরিখায় হঠাৎ ঝরায়
পাংশু মুখে মৃত্যুর কুয়াশা,
তীক্ষ্ণ রক্তে
অন্ধকার
জাগাবে উদ্যত প্রতিশোধ,

বিজয়ী রথের চাকা
ধমকাবে লাল্‌চে কাদায়,
সামনে দাঁড়াবে খাড়া মাংসের প্রাচীর।
আসুক আসুক ওরা মানুষের অসমসাহস।

মাটির কবরে আসে
দুর্বিনীতি তৃণের বিদ্রোহ।

কসাকের ডাক : ১৯৪২

আজভের পিঠের উপরে
চাবুকের শিস শোনো।

দুই হাজার মাইল দূরে
ঝড় উঠে মিলিয়ে গেল সুমেরু-শিখরে,
মিলিয়ে গেল তুন্দ্রার তুষার-শিবিরে,
ভাল্‌দাই পাহাড়ে
রক্তের দাগ শুকিয়ে এল বুঝি।
সাঁজোয়া থাবা বাড়িয়ে সেই বুড়ো জানোয়ার
ছিঁড়তে চেয়েছে হৃৎপিণ্ড,
বিশ্বাসঘাতী বাঘনখ প্রতিহত—
মস্কো···মস্কো।

তারপর অগণিত প্রেতমূর্তি নামে
দক্ষিণে
কালো মাটি চিরে—
১৯১৭-র নভেম্বরের সকাল
বিদ্যুৎগতি অন্ধকারে
জারজের উত্তরাধিকারে আচ্ছন্ন আবার।
এবার কসাকের কড়া পাঞ্জায় চূড়ান্ত মীমাংসা।
মজ্জায় মজ্জায় এ কৃষাণকে চেনো :

ইউক্রাইনের গমের চারায় কুলাকের হাড়ের সার,
আর ধমনীতে জনের স্রোত।
জনসাধারণ অসাধারণ।

কৃষ্ণসাগরের কাল ঘণায় অপূর্ব আক্রোশ—
দুশমন।
আজভের মাথার উপরে ঝাপট,
জনের রক্তস্রোতে ডাক :
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও—
সাদা রুশিয়ার ভাই হো
বড় রুশিয়ার ভাই
সারা দুনিয়ার ভাই হো
এক সাথে দাঁড়াই
দুশমন রুশিয়ার
দুশমন দুনিয়ার
হাতিয়ার দাও ভাই হো
হাতিয়ার।

সমতলের শব্দ পাথরে পাথরে বাজে কঠিন।
উরালে কলকারখানায় ঘর্মস্নান,
দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর সাইবেরিয়া অশ্রান্ত,
পামীরে ককেশাসে কঠিন আওয়াজ—
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও।

স্টেপ্-এর আদিগন্ত মায়া মরুবালুতে বিলীন।
সার্থবাহপথে কে যায়—কারা ?
উটের কঙ্কালের ছায়ায় অস্পষ্ট কবন্ধের পাল।
খিবা বোখারা সমরকন্দ থেকে লোহার গাড়িতে
আসে মানুষ কাতারে কাতার।
জনের দুই তীরে অবন্ধুর-স্ফুলিঙ্গ,

খোলা তরোয়ালে রক্তের তাল,
আর জনের মোহানায় ডাক :
গোলামের দল ফাঁস জড়ায়
পূবে পশ্চিমে বিষ ছড়ায়
সাপের শ্বাস
প্রভু আমাদের চায় মরণ
অগ্রদূতের প্রাণহরণ
সর্বনাশ
ভাই হো

জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া
সোভিয়েট রুশিয়া
জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া
রাখবই
ভাই হো
তোমাদের দুনিয়াকে রাখব
রুখবই দুশমন রুখব
দোসরের মুখ চাই ভাই হো....
হাতিয়ার।

বসন্ত-বাণী

বসন্তে আহ্বান এলো : অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরোধ করো,
তড়িতে আঘাত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ সন্ধানে হানো দেখি।
শীতের তুষার ক্ষ'য়ে রক্তের প্লাবন খরতর ;
আকাশের শ্যেন দৃষ্টি, জলজ্বল ক্ষুরধার যেন।
বসন্ত-বিহ্বল লোভ ঘিরে নিল ঘরে ও বাহিরে
সর্ব অঙ্গ। অনিবার্য আমন্ত্রণ সকলের কাছে;
প্রবেশের দ্বার খোলা নিষ্প্রদীপে সশস্ত্র শিবিরে।
শৃঙ্খলার সমারোহে স্তরে স্তরে সংঘাতের বীজ;

প্রত্যক্ষ মৃত্যুর ফাঁদ দেখে নেওয়া চূড়ান্ত এবারে,
অবিশ্রাম উন্মাদনা বিস্ফোরণ আসুক নিকটে।

বসন্ত-বাণীতে আলো।   ধ্বংসের প্রাচীন অধিকারে
একাত্ম অস্ত্রের শানে শেষের অধ্যায় গাঁথা আছে।

দিবাস্বপ্ন

ঠোঁট-চাপা তর্জনী ডিঙিয়ে
পিষ্ট প্রশ্ন কোনক্রমে এসে পৌঁছয়
এই শহরের রাস্তায়।
শরতের বজ্রস্বরে
উত্তরপশ্চিম কোণে
ঐক্যতানে কামানগর্জন শোনা যায়।

পুজোর বাজারে
দুপুরে শুকনো জিব টেনে চলতে চলতে
কটাক্ষে দেখি
ছেঁড়া ঠোঙা শালপাতার সঙ্গে
একখানা চুক্তিপত্র উড়ে গেল।

মিনিটে মিনিটে সামরিক লরি,
সৈনিকের পীতাভিত লাল মুখ
আকর্ণ হাসিতে অর্থহীন।
হঠাৎ কানের কাছে রাইফেলের আওয়াজ,
বিমানের অভ্রান্ত পরিক্রমায়
অকস্মাৎ অসাধারণ বিক্রম—
মেশিনগানের গুলি ছুটছে উপর থেকে,
হিন্দুস্থানের জল স্থল অন্তরীক্ষ প্রকম্পিত,
নিরস্ত্র করতল শূন্যে বাড়ালেই বুলেট ঠেকে।

রাস্তার মধ্যে চত্বকে মনে করি
দ্বিতীয় রণাঙ্গন।

অগ্রবর্তী
হাতের চাপে বরফ গ'লে যায়
সাইবেরিয়ায়!
পদে পদে প্রাচীন সমাধি
উচ্ছন্ন জঙ্গলের ভিতর থেকে অদৃশ্য,
বাষ্প আর বিদ্যুৎ বিপ্লব বাধায়।

আপাদমস্তক এক উত্তেজনার মূর্তিমান
অপ্রত্যাশিত বিশ বছর।
যন্ত্রের হাতল কাঁপছে।

ময়ূরতক্ত আঁটবে না খোলার ঘরে,
চিম্‌নিতে ময়লাই উড়বে, আর
সসাগরা পৃথিবী পক্ষীরাজে ঘুরবেন রাজপুত্র · ইত্যাদি,
প্রাপ্তবয়সে উবে গেল উপকথার আসর।

প্রত্যাশী কপালে এখন করোটি বাজে না,
অদৃষ্ট দুহাতে রোখা।
সিধে শিরদাঁড়ায় চিড় খেল মেরুদেশ
সিংহতোরণের পর বিশ বছরে।

নিরাভ শূন্য সূচ্যগ্র প্রশ্নে আহত,
সাইবেরিয়া উত্তর দেয়।

আন্তর্জাতিক
সেই সীমান্ত এমন অনিয়মিত।
অস্থির পায়ে মুছে যায় চেনা রেখা,

দেখেছি যেখানে মন্দিরে নিশানা খাড়া,
নজরে এখন আসে না নিষেধ-লেখা।

শব্দভেদের কৌশল গেছে বৃথা,
তূণে আর তীরে ঘুণ ধ'রে গেল শেষে ;
শাসন-কুশলী হাতে ছিল রাশ টানা,
কখন মিতালি ঢুকেছে ছদ্মবেশে।

এত রাজ্যের ঘাঁটিতে পাহারা জাগা,
বুটের গোড়ায় মাটিতে গভীর ক্ষত,
কুটিল রক্তে আপ্রাণ হুঁশিয়ারি,
বেপরোয়া হাওয়া তবুও অব্যাহত।

দুর্গম পরিবেষ্টন যায় ভেঙে,
অর্থ হারায় নেশায় শেখানো বুলি,
ক্ষুব্ধ হাপর গড়ছে শক্ত সেতু,
ভিতের তলায় গড়ায় মাথার খুলি।

পূর্বখণ্ড

আচ্ছন্ন

মিথ্যা নয় অভিশাপ লেগেছে তোমার,
যুক্তিহীন অসঙ্গত অন্ধ অভিশাপ।
কথা কবে হল শেষ, তবু তার তাপ
আরো যেন বেড়ে চলে। তোমার ভাবার
এতখানি জ্বালা আর এত হবে ধার
ছিল না বিশ্বাস, তাই ছিল না সন্তাপ।
তুমিও ভাবিয়াছিলে হবে অপলাপ
অবহেলে ব'লে-ফেলা মুখের কথার।

ধ্বনি তা দূর হ'তে শোনাই তোমায় :
তুমি যা বলিয়াছিলে তাতে ছিল বিষ,

অবোধ সে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করেছে
স্ফুটন্ত রক্তের স্রোত আমার শিরায়।
বায়ুস্তর ভ'য়ে ওঠে বিবর্ণ কপিশ,
তোমার গলার স্বর ফেরে শুধু নেচে।

প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি—
পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে
শব্দের ঝড় ওঠে ভীষণ বেগে,
সাধ্য নাহিক' তার সংখ্যা গণি।

কবেকার অন্তিম আর্তনাদে
শিহরণ লেগেছিল অস্ত-চাঁদে,
সঞ্চয়ে রাখিয়াছে আজিও তারে
পর্বত প্রান্তর অন্ধকারে।

শৃঙ্খলে বেজেছিল মুক্তি বাণী,
সে-ধ্বনিতে কেঁপেছিল অরণ্যানী,
সেই বাণী বিস্তৃত শূন্য ভরি'
তরঙ্গ ওঠে তার শৃঙ্গোপরি।

উপত্যকায় কোনো ছিল না সাড়া,
পাহাড়ের গায়ে গায়ে লাগেনি নাড়া,
স্তব্ধ সময় ছিল অন্যমনা,
প্রহর করিত যেন প্রবঞ্চনা।

তারপরে বদ্‌লাল প্রাচীন ধারা,
একদিন শেষ রাতে ভাঙ্গল কারা;
যে-প্রাণী সেদিন এল লঙ্ঘি বিধি
অবশেষে লুটাল সে ছিন্ন-হৃদি।

তার খুনে লাল হল পাহাড়ী নদী,
আকাশ মূর্ছা যেত দেখত যদি।
তবু তার কণ্ঠের অমর বাণী
চাপিতে পারেনি, শুধু পরাণ-হানি

সেদিনের শব্দের জয়-পতাকা
উড়িতেছে দিকে দিকে, নেইক' ফাঁকা
মাটি আর শূন্যের একটি কোণও,
কান পেতে ওই তার আলাপ শোনো।

অরণ্য

গাঢ় বনানীর শাখা প্রশাখায় নড়ে
দিবসে-ঘুমানো রাত-জাগা পাখি সারা রাজ্যের যত,
নখে নখে হয় তরু-বল্কলে ক্ষত,
পাংশু সবুজ পাতায় পাতায় পক্ষের ছায়া পড়ে।

নিঃঝুম বন অসংখ্য শিরে তার
ঝিম ধ'রে থাকে স্থবিরের মতো গহন অন্তরালে,
বৃক্ষলতায় জড়াজড়ি, ডালে ডালে
জট বেধে যায়, ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে রচি' রাখে কারাগার

তৃণগুল্মের ঝোপেঝাড়ে দূরে কাছে
নিঃসাড়ে জাগে বহুরূপী নানা সন্দেহসংশয়;
কি জানি কোথায় কী যে অদৃশ্য রয়,
শিকার ধরার লোভ কোন্‌খানে লাগায়িত হইয়াছে!

এই অরণ্য—গূঢ় বেষ্টন এর,
মূলে মূলে আর লতায় পাতায় জড়ায় তোমারে ঘোরে।
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে শুঁড়িগুলি রাখে ভ'রে
হাঁপ ছাড়িবার ফাঁকা জমিটুকু, রং ঢাকে আকাশের;

দুজনেই মোরা অরণ্য-শিশু জানি,
এরি ফলে জলে, এরি প্রাচুর্যে পুষ্ট মোদের দেহ ;
তুমি জানো সখি জানো নিঃসন্দেহ
কত স্ফূর্তি ফোটে বন ফুলে ফুলে মর্মের সন্ধানী।

তবু আমি এই অরণ্য ঘৃণা করি,
সমস্ত মোর অন্তর দিয়ে অনায়াসে করি ঘৃণা,
বিশ্বাস করো, কাতরা কণ্ঠলীনা—
মুকুরের মতো নয়নে তোমার আমার মনেরে ধরি।

শাখাপ্রশাখায় জটিল বনানী ব্যেপে
রোজ শুনি ওঠে টুঁটি-চাপা টানা গোঙানো আওয়াজ কার,
ঘন নিঃশ্বাসে ফোঁসায় অত্যাচার ;
বনবাসী সবে তবু সুখে সাধে গায়ে গায়ে থাকে লেপে।

অরণ্য মোর অসহ্য তাই লাগে,
শোনো তুমি শোনো, সম্ভব নয় এরে মোর ভালোবাসা ;
যারা ভালোবাসে তারা তো বেঁধেছে বাসা,
দিবসে ঘুমায় রাত জাগে তারা বক্ষলে নখ দাগে।

দিবস-রজনী

অকস্মাৎ শঙ্কা কেন জাগিল তোমার ?
শঙ্কা কেন কাঁপিতেছে নয়ন-পল্লবে ?
কটাক্ষ নিভেছে আঁখি-তারকার নভে,
ওষ্ঠে সন্ত পলাতকা হাসির রেখার
চিহ্নটুকু লেগে আছে এক প্রান্তে শুধু।
চকিতে কি মরীচিকা ছবির মতন
মুছে গেল মরু-পারে, বিহ্বল গগন
ঝলসিয়া ওঠে আর বালু করে ধু ধু ?

বুঝেছি তোমার দুঃখ এল আকস্মিক,
তোমার সুখের নীড় ভেঙে যাবে, তাই
ক্ষতির হিসাবে আজ মন কাঁদে ঠিক—
তোমার খেলার ঘর পুড়ে হবে ছাই।
যারে নিয়ে লুব্ধ লীলা প্রতিটি নিমেষ
জেনেছো আসন্ন হল তার নিরুদ্দেশ।

২

কী আছে সান্ত্বনা বলো, কী আছে বলার?
জানো মোর ললাটের অলঙ্ঘ্য লিখন;
উৎসর্গ-অঞ্জলি ভরি' রক্তিম যৌবন
ধরিল যে তার কিছু নাই বলিবার।
কানাকানি পড়িয়াছে, অবুঝের দল
তোমারে ঘিরিয়া এল সমবেদনায়;
ওদের দরদ দেখি তোমারে কাঁদায়,
কি জানি এমন শোকে আছে কিবা ফল।

কথার সুযোগ নাহি, শ্বসিতেছে বায়ু,
অস্থির আক্রোশে চাহে বিপদের বলি
কক্ষচ্যুত গ্রহ যত, দাবি দুর্নিবার;
অধৈর্য হয়েছে মোর শরীরের স্নায়ু।
নিশ্চিন্ত নীলিমা হ'তে পড়ে যাব খলি',
জীবন জলিয়া যাবে তোমার আমার।

৩

কোথায় উঠেছে চাঁদ, কোথায় তপন।
আমাদের দুজনার রাত্রি আর দিন;
ওখানে কাঁদিছে রাত্তি, এখানে কঠিন
দাহনে জলিছে দিবা পাষাণ-শ্রবণ।
তোমার চাঁদের 'পরে অশ্রুর তুহিনে
আমার সূর্যের শিখা হিম হয়ে গেলো,
আবছা আলোয় কাঁপে ছায়া এলোমেলো—

নিষ্ঠুর দিনের ছায়া রাত্রির গহীনে।

পৃথিবী হয়েছে দ্বিধা যে-পৃথিবী মোরা
গড়িয়াছিলাম যত্নে মাটির মায়ায়,
ভিন্ন আজি দুই লোক উন্মাত্ত পায়।
মিলন-সাথীরা নাই, কখন যে ওরা
নিঃশব্দে ঝরিয়া গেছে সেই অবেলায়।
এখন রজনী তব, দিবস আমার।

শোভাযাত্রা

পথের দুধার দিয়ে মানুষের ভিড়,
ছত্রভঙ্গ ছন্নছাড়া দল,
অবসন্ন পদপাতে ক্লান্ত গোধূলির
লঘু রেণু ওড়ে অবিরল।
এরা সবে যায় আর ফিরে আসে
ঘন জনতায়,
প্রত্যহ সকাল সাঁঝে ঠেলাঠেলি
পড়ে একই পথে ;
এদের জীবনযাত্রা আলো আর
আঁধার সীমায়
দুলে দুলে চলে কোনোমতে।

গৃহের বাহিরে হায় কী কঠিন ভূমি
শাণিত বন্ধুর বালুময়।
গৃহের বাহিরে মৃত্যু ওষ্ঠে ওষ্ঠ চুমি'
অবয়বে আনিবে যে ক্ষয়।
প্রাচীরের আবরণে ঘিরে রাখা
একটু মাটির
আশ্রয় মাগিয়া মন কেঁদে মরে
সারা দিনমান,

দিনান্তে ফেরার বেলা কাঁপে তাই
পীতাভ আঁখির
ক্ষীণ জ্যোতি, কাঁপে ম্রিয়মাণ।

এরি মাঝে একি একদিন
কৌতূহল জাগে সীমাহীন
ইহাদের স্তিমিত আঁখিতে;
পথের দুধার দিয়ে যারা
ভিড় করে, ঘোরে লক্ষ্যহারা
তারা চেয়ে দেখে সচকিতে
পথের উপর দিয়ে শোভাযাত্রা যায়,
সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা, তাল তার
বাজে পায় পায়।

চলিয়াছে শোভাযাত্রা পথের মাঝারে
ঋজুগতি গভীর প্রবাহ,
পাষাণের পাদপথ বাঁধানো দুধারে
ঠিকরায় অনলের দাহ।
উদ্গত সে-উৎস মুখ কোন্‌খানে
জনতা জানে না,
জানে না কখন শুরু আজিকার
এই অভিযান;
তাই তো চাহিয়া রয়—এরা সবে
এমন অচেনা,
এমন দুস্তর ব্যবধান।

শোভাযাত্রা মাঝখানে—দুই ধারে ভিড়,
ছন্নছাড়া মানুষের দল,
বাতায়নে স্নিগ্ধশিখা মমতা-নিবিড়,
তারে ঘিরে বাঁচিবার ছল।
প্রত্যহ বাহির হতে গৃহকোণে

ফেরার বেলায়
যাহাদের ঠেলাঠেলি ছত্রভঙ্গ
ব্যস্ত কোলাহলে,
তারা আজি পথপরে কৌতূহলে
থমকি দাঁড়ায়
দেখে চেয়ে শোভাযাত্রা চলে।

জীবন দক্ষিণা

তোমরা সকলে মিলে আমারে বোঝাও ভুল অনেক রকম
অজস্র মধুর কথা আহরিয়া গড়ো
মধুচক্র কামনার, তোমাদের সকলের কৃতিত্ব চরম—
মিথ্যারে এমন ক'রে মনোহর করো।
হাসিতে সোহাগে লাগে নেশা,
মন্থর-সঞ্চারী বিষ মেশা।
সম্মোহন-মন্ত্র রচে তোমাদের সপ্তস্বরা বীণা—
আমি কি জানি না?

গণ্ডিঘেরা অন্তরালে নিশ্চিন্ত বিলাস, তারে প্রেম দিলে নাম,
তোমাদের ভালোবাসা পরশ-কাতর;
প্রত্যহের প্রবঞ্চনা, তোমরা বলিছো তারে জীবন-সংগ্রাম,
রক্তে রাঙা স্বর্ণস্তূপ—দেবতার বর!
শঠতা রয়েছে শুভাশীষে,
প্রাণেরে মারে সে পিষে পিষে।
পৃথিবীরে পর করে তোমাদের ঘরের আঙিনা—
আমি কি জানি না?

খনির গহ্বরপথে গভীর পাতালতলে যারা গেল নেমে
তাহাদের অনায়াসে ভুলে যেতে বলো;
তোমরা ভুলাতে চাও ঐশ্বর্যের পিছনে যে রহিয়াছে থেমে
যুগান্তের ইতিহাস অশ্রু-ছলোছলো।

উৎসব-উল্লাসে নিশি-শেষে
শোকের মূর্ছনা এসে মেশে।
তোমাদের লোভ চায় তিলে তিলে জীবন-দক্ষিণা—
আমি কি জানি না?

আমরা চেয়েছি শান্তি

আমরা চেয়েছি শান্তি আজ তার অবসাদ ভারি,
মুমূর্ষু রোদের মতো ঝিমানো জীবন;
আমরা পুষেছি আশা বিহঙ্গ সে দূর নভোচারী,
মাটিতে ঝরেছে তার পালক চিকণ।

চোখের পাতায় ছিল স্তূপাকার আধ-আধ ঘুম,
স্তিমিত শয়ন-দীপে স্বপন-রচনা,
আমরা দূরের থেকে দেখিয়াছি আকাশ-কুসুম—
কোথায় সে-ফুল আর কোথা বা কামনা।

কখন লেগেছে মরু ঘূর্ণিস্রোত ঘুমন্ত বেলায়,
কখন কেঁপেছে রাত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে—
দূরের নির্বিঘ্ন কোণে তার সাড়া সুখের মেলায়
হারায়ে গিয়াছে শুধু মিথ্যা অবিশ্বাসে।

যাহারা চেয়েছে শান্তি তাহাদের অবসাদ ভারি,
সোনার শিকলে সুর ক্লান্ত বিলাপের;
আকাশ-কুসুম যারা দেখেছিল তাদের সবারি
অলক্ষ্যে ঝরেছে দল বিবর্ণ ফুলের।

উৎসের দিকে

ছুটি

দাঁড়াই তারার নিচে,
জোনাকি-চুমকিতে ঝলমল
দু-দণ্ডের ছুটি,
ঝলকে ঝলকে ভাসে বনবনমায়াবী মর্মর,
রণাঙ্গন বিকশিত ফুলে
লতায় পাতায়, মমতায় ঝরাঝরা,
পরাক্রান্ত ভূমি
স্তনভারানত লাগে,
ছিটোনো রক্তের বিন্দু চুনি।

আমার তুরঙ্গ-প্রাণ
রণদাপে দুর্মদ সে-প্রাণ
কী আশ্চর্য স্নিগ্ধ চালে চলে
পদ্মসরোবর পাড়ে
লজ্জাবতী ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভুঁয়ে,
স্মৃতির ভোমরা ফেরে
গুনগুন, গহীন গাঙের ভাষা শুনি,
কলাপাতা-কাঁপা কথা,
শিরশিরে খড়ে-ছাওয়া অবোধ্য অগাধ আধোবুলি

মুখর সৈনিক ফিরে চলি,
কালিমাড়া দু-আঙুলে তুড়ি দিয়ে গান ধরি,
অবাক নীলিমা থেকে রিমঝিম শ্রাবণ ঝরাই,
হাড়ের মালায় গাঁথি প্রেম,
নেশালাগা চোখে
উথলে উঠল সব ধানের মরাই,
হৃদয়বিদার সন্ধ্যা এতক্ষণে হল যে মধুর,
তারা-স্নেহ ঢাকল কঙ্কাল।

দুস্তর যন্ত্রণা ছেনে এ-মুহূর্ত গ'ড়ে ওঠে।
যোদ্ধার উদ্দেশে রুগ্ন হাত
রেখেছে প্রণাম, তারপর
হয়েছে পাথর,
ধুলোয় এখনো ছক আছে
বুকে-হাঁটা অগস্ত্য-যাত্রার,
প্রতি অঙ্গ কেঁদেছে দুর্বহ
শপ্ন দেখে, পেটপিঠ মিলেছে অস্থিম
জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে
সৈনিকের পায়ে পায়ে,
খোড়ো চাল উড়ে গেছে
গলিতে মাঠের পাশে পুকুরের পাড়ে।
আমার এ-পেশীর ছিলায়
পড়েছে আকর্ণ টান
শ্বাপদসঙ্কুল ভিড়ে
উদ্ভ্রান্ত গৃহের ধারে
দৈনন্দিন সমরসজ্জায়।

ধরমুখো সঙীনে বিঁধে
উঠল ঘুমন্ত তোড়া,
ভেসে এল
ভেসে এল আগামী সকাল থেকে
দু-দণ্ডের ছুটির জোয়ারে।

ম্যাজিক

বাতির দুর্বল ছায়ানাচ
তাই বেয়ে সরীসৃপরা এ ঘরে ঢোকে,
বাড়িয়ে দিলাম যদি শিখা
বিরাট সর্পিল ভঙ্গি ভর করে প্রতি রক্তে।

জলাভূমি শ্বাস ছাড়ে সূর্যাস্তের পর,
বিস্ফারিত রোমকূপে ঢেউ লাগে,
আকণ্ঠমগ্নের দোলা বৃন্ত ভুলে ছিঁড়েছে কোথায়
ছড়ায় সে-তীব্র ঢেউ আকাশে বাতাসে।

বঙ্গপ্রান্তে বেতারে কম্পন থরোথরো
বার্তাবহ।
ফসল মাড়িয়ে গেল অশ্বারোহী বিজয়ী পাগল,
আলিঙ্গনে চূর্ণধুলো নকল পাঁজর।
গড়বন্দী প্রেম
মেলল যে পতঙ্গপাখা,
সেতুহীন প্রণালীর ওপারে নির্মম
অহঙ্কারী অগ্নি বজ্র ছুঁড়ে দিল
এপারে সন্তানদের মাথার উপরে।

ডানে বাঁয়ে দুলে
লম্বমান ঘণ্টা আর মিনিটের জাহু
সম্পূর্ণ মর্মরমূর্তি ধরে,
এমন সময়
আমাদের বন্দরের কিনার উথল
মূর্তি ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো,
কুড়োই সে-কঠিন ঝঞ্ঝনা,
ভিজে মাটি নীবার-মঞ্জরী
ভঙ্গুর নীহার,
ঝ'রে-পড়া শস্তকণা
শুধু প্রতিধ্বনিতে মুখর।

সুজলা সুফলা দেশে
ভালোবেসে সূর্যপ্রদক্ষিণ
থেমে গেল,

পরিস্থিতে পদ্মাক্ষের ক্ষত
অগাধ গহ্বরে
আহ্বান করেছে বেনো জল।

অক্লান্ত বেতার বন্ধ করি,
নোনাজলে ক্ষয়লাগা পাড়ের যন্ত্রণা
মুছে দিই দুই কান থেকে,
এখন হলাম আমি ধ্যানী
পদ্মাসন আমার ম্যাজিক,
ধীরে ধীরে
বাতিটার আঁকাবাঁকা ছায়াগুলো
জ্যান্ত হয়ে ওঠে।

মুখর

এতগুলি বন্ধ্যা মুখ খুলে গেল ফসলের সুরে,
কর্কশ বাতাসে
বন্ধুদের স্মৃতির গুঞ্জন
ঘুরে ঘুরে মৃতপ্রায়, হঠাৎ জীবন পায়
ঘূর্ণির ফুৎকারভরা উচাটন আহ্বানের ঝড়ে,
তারা সব প্রাণ পায়,
শ্রাবণ আকাশে তীব্র উর্বর মেঘের মাতামাতি,
তারা সব প্রাণ পায় ভাঙনের নদীর দুকূলে,
পোড়ো জমি জুড়ে
সোনালি খুশির শীষ ভরপুর ঝড়ের দমকে।

স্বচ্ছ চোখ মর্মরের মতো
চেয়ে থাকে
তারপর অশ্রু ফেলে, বর্ষণের ধারা নামে,
গভীর ইচ্ছার সরোবর
ঢেকে দেয় বিচ্ছেদের তৃষ্ণার্ত সফর।

এতগুলি বন্ধ্যা মুখ খুলে গেল নক্ষত্রের সুরে,
শ্রাবণসন্ধ্যায় দেখি মেঘচাপা মাথাগুলি জাগে
আকাশ ফুঁড়তে চায় ললাটের উজ্জ্বল ফলকে,
রক্তিম সময়
ভর রাখে প্রজাপতি-পাখনায়
আলোর ফুলের শূন্যে শূন্যের শোভায়,
হৃৎপিণ্ড খালি বাজে উন্মত্ত বাজনায়,
বোবা যত আড়ষ্ট ইঙ্গিত
সুরে সুরে ফুটে ওঠে আকাশের গায়।
নিঃশব্দে পাহাড় ফেটে উদ্‌গিরণ অজস্র কথার,
যারা রুদ্ধ দিনের গুহায়
অনুভব করেছিল পাষাণের ভার
তারা পেল মুখর উল্লাস,
তাদের সন্ধান দেখি স্ফুলিঙ্গের মণি-জ্বলা শ্রাবণ সন্ধ্যায় .

নভেম্বর

কারখানাঘর ভেঙে এল কয়েদীরা
বাইরে, মাঠের বন্দীরা হাঁকে,
ঘৃণায় ভারী আঁধার
কোটি সকালের লাভা লেগে টলে
গলে জ্বলন্ত পথে,
শীতের আমেজ
ভাঙা কাচগাঁথা,
ছেঁড়া কাঁথা ফাড়ে
টুকরো টুকরো ওড়ায় শুকনো পাতা,
দুর্গে প্রাসাদে জমা জঞ্জাল ওড়ে
হেমন্ত রোদ্দুরে।

বুড়ো বুদ্ধির ঘুরপাক চলে হায় রে হায়।
চালু কারখানা চষা ক্ষেত থেকে অসংখ্য

কণ্ঠে জবাব বিনা দ্বিধায়,
অসংখ্য
আঙুল বাকল দাঁড়াশির মতো,
বন্দী গলার কাতরানিটুকু
সুরেই বাজল,
বিশাল ঐক্যতানে
ভরল পৃথিবী—
মুক্তি আমার, মুক্তি তোমার, মুক্তি।

সে আমার নবজন্মের দিন
নভেম্বরের আভায় রঙীন
মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সেই যাত্রা আমার
চোখে ভাসে :
দাঁজোয়া মনের বাঁধে আছড়ায়
ঝোড়ো ইতিহাস,
কালো কালো সব চিম্‌নি ছাড়িয়ে
মাথা ওঠে তার—
ভ্লাদিমির ইলিইচ লেনিন।

দশটা দিনের চূড়ায় জ্বলল
মশালশিখা
দশটা দিনের বনিয়াদে চাপা
শতাব্দীরা।
আমার সে-শিশুচোখের সাক্ষ্য
সবার চোখে ;
দশটা দিনের মিনারের আলো
ছড়ায় ছড়ায় পৃথিবীময়।

নভেম্বরের শুরু
বারো মাস জুড়ে কথা বলে

গঙ্গার ধারে লালদীঘি ঘিরে গাঁয়ে
যেখানে দুর্গপ্রাসাদের ভিড়
গুরুগম্ভীর,
পাতাবাহারের আড়ালে ক্ষিপ্র বাঘ ফেরে।

নভেম্বর এক থরকরবাল
পশ্চিমে ঘন রাত কাটে
আমার এখানে হেমন্ত রোদ্দুরে
পথ কাটে।

রাস্তা বোঝাই তোমরা

রাস্তা বোঝাই তোমরা কাঁপতে থাকলে,
আগুপিছু অস্থির সওয়ার
নিয়ে যাবে ঠাসা মৃত্যুর খাসা ঘরে,
কুম্ভকর্ণ বাড়িগুলো
খড়খড়ি মেলে তাকাল নিচে
যেখানে অথই সকলে দাঁড়িয়ে
লঙ্গরখানা বিনীত যেখানে
সেখানে।

কোন্ মান্ধাতা আমলের ঢাল
ছিন্নভিন্ন, অমোঘ বর্শাফলক
চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই
বায়ুভরে হৃৎপিণ্ডে যে পৌঁছয়,
হাঙর-হাওয়ায় জীবন জুড়োতে কে পারে ?
কাঁটাতারে ভর দিয়ে ক্ষণিক
শুধু নিষ্ঠুর বাগানকে দেখা
প্রাণান্তিক।
অক্ষয় ক্ষত চিতায় পোড়ে
কাফনে ঢাকে,

করে অকাতরে পাকে মোড়ে
অদ্ভুত আয়।

বরফ-রাত্রি খুঁড়ে খুঁড়ে
তোমরা চললে,
কী কথা বললে ?
ছেঁড়া বরফল-বিধূনিত ধুম শাদা পথে,
ডানে বাঁয়ে ঘোর পতনের মুখে
নিরেট পাথরে কোন্ ধিক্কার
তোমরা রাখলে ?

—আমরা পেয়েছি আঁধার বন্যা বিস্তর কাল,
আমনে আউশে ডুবেছি আমরা
খুদের ভেলায় ভেসেছি শ্রান্ত গ্রামান্তরে,
সোহাগে রুদ্ধশ্বাস বহু রাত
ছাতিফাটা সেই জোয়ারে জেগে
জলেছি আহত
জলেছি দ্বীপের কিনারে আমরা,
গলেছি রুগ্ন ভিটায়, বেঁচেছি বুকের বাঁধে।
সে-কালো বন্যা এখানে আনল
গল্পের শেষ ছত্র টানল,
আর কী চাই ?
ধনধান্যে ও পুষ্পে ভরা
দুই পারে আহা বসুন্ধরা।
বাড়ি দিয়ে আর গাড়ি দিয়ে আর শাড়ি দিয়ে
তৈরি সেরা
দুই পাড় আহা।
এক দুর্বোধ মুহূর্তে খালি রেখে নিলাম,
মাঝখানে স্রোত বইলাম,
খুড়কুড়ো গেল, বুক বাঁধবার ভান গেল খ'সে,

গ্রাম থেকে বানে
রাক্ষুসে টানে চললাম,
আর কী চাই ?

তোমরা চললে,
ভিটেমাটি-ছাড়া ভাবনার পাখা
উড়োল অন্ধ পাতাগুলো,
শেষ ছত্রটা গুঁড়োল ভেঙে।
দৃশ্য জমাট বাঁধবে যখন
ফিরবে তোমরা,
অক্ষয় ক্ষতবীজে জন্মানো
জীবন ভ'রে
ফিরবে তোমরা,
পার্কে মোড়ে
ঘিরবে তোমরা
হিংস্র এলাকা ঘিরবে।

আমরা দখল নিলাম
তোমার সঙ্গে উঠেছি নতুন চরে
আমরা দুজন স্বপ্নের দেশ মাড়াই।
পক্ষাঘাতের শিলা গেল খ'সে,
বাহুপদ-ঝঙ্কার
সুবর্ণ প্রান্তরে
ছাপায় শূন্য, আমরা অঙ্গ মেলি
যোজন যোজন, অলঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়াই।

গেরুয়া ভাঙন বেগে বয়, কাঁচা জমি
আঁটো হয়, তার কাঁপন
বিদ্রূপ, তার বালুমুষ্টিতে ধরা
অজেয় শিকড়।

ডোবা বালিয়াড় অঙ্কুরে ফোটো-ফোটো,
অন্তর্ঝিল্লী-ঝরা
বাঁচবার রস বিন্দু বিন্দু
ছেয়ে ফেলে মাটি, মুগ্ধ রাত্রিযাপন।

আমরা পেলাম গড়বার ঠাঁই,
দুই আঁজলাতে ভ'রে
পৃথিবীকে দান নিলাম।
চড়ো মাঠ ধরে আয়না আবার দেখি
আমাদের আশা দিগন্ত-ভালোবাসা,
দেখি অপূর্ব মিলান
সাত রঙে মিল উদয় অস্তে বাঁকা,
আমাদের মুখে ভাষা
ফুলঝুরি কাটে,
অজগর-নদীগর্জন
ফিসফাসে ঘোরে বাষ্পগুচ্ছে,
আমাদের মুখে দাগা
যন্ত্রণা ফোটে চিকন পুষ্পে,
চূণ মমতা ফোয়ারায় ওঠে
হাজার ধারার ঝারি,
বন্ধু বন্ধু প্রতি কণা চিনি আপন।
তোমার আমার স্বপ্নের দেশে
একটি শপথ উদগ্র তরবারি
হীরাধার জ্বলে,
একটি শিরায় দপদপ টের পাই,
একটি সময় ম্লান করে আর সকল।
আমরা প্রথম আঁকড়াই পায়ে
পিঙ্গল রেণু দানাবাঁধা কাঁচা জমি,
অপ্রতিরোধ্য বাহু
আমরা দুজন মেলি,

পিছনে আসবে দৃঢ় অক্ষৌহিণী
সেই প্রত্যয়ে আমরা দখল নিলাম।

বর্ধমান

থমথমে বাড়ির সারিকে
অসহায় ক'রে
বৃষ্টি এল।
এক বন থেকে অন্য বনে বিচ্ছুরিত সঘন গমক
এসে জোটে চৌকাঠের ধারে
মাথা কোটে বিবাক্ত গরজে,
সর্বাঙ্গে আপন ক'রে তাকে ঘুম পাড়াবার
আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল,
কয়লার ধোঁয়ার কুয়াশার
গ্রন্থিল স্পর্শের নিচে ধমনী কাতর।

পাঁচিলে গুলির দাগ স্ফীত হয়
জলে ভিজে,
দৈত্যের প্রকাণ্ড লুব্ধ মুঠির আকারে
স্ফীত হয় স্তম্ভিত প্রদোষে,
খরশান হাজার বল্লমে
পর্দাগুলো ছিঁড়ে কুচিকুচি
অলিন্দ চত্বর অসহায়।

আমার এ-শহরের মাঝখানে নির্জন নদীর
ঘাস-মোড়া পাড়ে
পায়ে পায়ে মরা পথ বেয়ে
জাহাজঘাটায় আজ যদি যাওয়া যায়
দেখা যাবে সমস্তই অস্পষ্ট কাঠামো।

ঝাপসা ওড়না ছিঁড়ে
জাগল মন্থর
সঙ্কীর্ণ কপাল সাদা,
সাদা ঠোঁট হিম গাল
স্তনভাঙা নিমীলিত বুক।
করুণ আশ্রয়প্রার্থী অবয়বে দ্বিধা
আমাকে পীড়িত করে,
সায়াহ্নে দুঃস্বপ্ন আসে জলে ভেজা পাঁচিলের কূলে

দ্বিধা ছাড়ো
তুমি দ্বিধা ছাড়ো
অন্ধ গলিমুখে
নিঃশব্দ কী হাসির বিদ্রূপ তোমাকে বিশ্লিষ্ট করে
তুমি জানো আমিও তা অনুভব করি।
বিভক্ত প্রতীক্ষা কেন
আর কেন ?
হে সাথী
বৃষ্টি এল।

সঞ্জীবন

অপরিচিত জ্যোৎস্নায় পাহারা-বদল হল ;
চলন্ত লৌহ-শিরস্ত্রাণশ্রেণী যেন করাতের দাঁত
আমাদের কারাগারের কপাট কেটে
আমাদের বনেদী শিকলের জোড় ফেড়ে
বুড়ো বটের অগুন্তি শিকড় দ্বিখণ্ড ক'রে
আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল সড়কে ময়দানে।

করাতের দাঁত আমাদের রক্তাক্ত করেছে ;
চামড়া ছিঁড়েছে, ছিঁড়ুক
মাংস চিরেছে, চিরুক

হাড় পর্যন্ত প্যাঁচড় লেগেছে, লাগুক—
আমরা বাঁচলাম।

মন্ত্রলোপ

দশটা আঙুল জড়ো ক'রে
করজোড়ে হয়েছি প্রার্থনাময় ;
ইতিহাস-বিখ্যাত তোরণে
অবসন্ন ঘণ্টার আওয়াজ
যেন মন্ত্র-উচ্চারণ,
গড়েছে অদ্ভুত আবহাওয়া,
প্রতিনিধি-সঙ্কল্পকে ছিনিয়ে নিয়েছে প্রায়
আবিষ্ট আমার মুঠো খুলে ;
বহুতর রুক্ষ অভিযোগ
আমার নয়নে ফুটে হয়ে গেল পূর্ণ অনুনয় ;
পিছনে নামিয়ে বোঝা আমি
সুঠাম মুদ্রায় কমনীয়.
ব্যক্তিগত ভঙ্গির বাহার
মনে হল অনির্বচনীয়।

আর আজ ?
একাগ্র উত্তাপে দগ্ধ পাষাণ-প্রচ্ছদ,
দশ আঙুলের ডগা অগ্নিবিন্দু।

গলি

কুটিল দংশন কাটে ধানশীষ মাঠে মাঠে,
গেঁয়ো সন্ধ্যা ভয় পায় ;
পাকা বীজ টুংটাং মিঠে নাচে
বেজেছিল ক্ষেতের ভেলায়,
পাগল ঝাউয়ের ফাঁকে
এখন হিংস্র সেই বোল।

দু-একটা লণ্ঠন বুনো চোখ
ডুবে গেল অচেনা গলিতে
সবাইকে টেনে গেল রক্তাক্ত যাত্রায় ;
সে-গহনে অগণ্য প্রিয়ের চলা,
স্নায়ু ফুঁড়ে আয়ুর দুর্বল গ্রন্থি বাঁধা
উন্মুখ বিশ্বাস পোষা বুকে ;

দাওয়ার ওপারে
সন্ত্রস্ত গলির কোনোখানে
ছায়া-ঝাঁটা আঁধার ফটকে
অগ্রদূত হৃদয় ঘা দেয় ।
তারপর কোন্ রাজ্য, কোন্ রাজধানী ?
প্রিয়তম কোন্ ভবিষ্যৎ ?

মরুযাত্রা
ধ্যানী বৃক্ষের ছায়া হেঁটে গেল—
তেপান্তরের নৃশংস তেজ নীল বিদ্যুৎ-
স্পর্শের মার দিয়েছে শরীরে,
মরুযাত্রায় সহিষ্ণু পিঠ হরধনু-ভাঙা,
ললাটপটের লেখা চৌচির, ভারতবর্ষ ।

কালের গরজ ক্রুরবিভঙ্গ—
গণ্ডূষে-ধরা সফরি ভগ্ন জীবনকে খোঁজে,
ব্যঙ্গে অকালমরণ সাগরে মন্থন তোলে ;
দেশবিদেশের কথকেরা দেখি
গলা-জড়াজড়ি, করুণ গল্পে অশ্রুসজল ;
চাঁদোয়া ঢাকা সে-আসর ছাড়াই পাগলা ঝোরার
অশান্ত টানে ।

আদি গঙ্গায় পাড়ি দিয়ে কোন্
স্তূপ গড়ি? তার শিখরে কেতন উড়বে কখন?
ভস্মলোচন উপসংহারে
দাঁড়ি টেনে দেবে অমরমূর্তি, ভারতবর্ষ?

জুয়াড়ীর দানে দুর্ভিক্ষের
উপহার গাঁথা মুণ্ডমালায়,
কূপমণ্ডূক লালসায় চিতাসজ্জার ঘটা,
অস্তাচলের নিষ্ঠুর ছোপ
রাঙায় কুটির রাঙায় খামার,
ঊর্ধ্বমুখের যুগ্ম কোটরে
স্থির দৃষ্টির ছুরিকাফলক, গগনস্পর্শী
সন্ধানী আলো।

দামা কঙ্কালে পথ বাঁধালাম—
জনসঙ্গীর অবিনশ্বর এই মূল্যের
পরিশোধ চাই,
ইতরজনের জিজ্ঞাসা জমে,
শেষরক্ষার সমস্ত ভার তুলে দিয়ে ছেলে-
ভুলোনো ছড়ার মুখস্থ গানে
নেই তার কোনো উত্তর নেই।
করাল প্রাচীরে সম্মুখ রেখা
ছিন্ন এখনো, ভারতবর্ষ।

জয়গান

আমার জয়ের গান টলায়
কলকাতার অথই ঘুমসাগর,
আমার ভেলায় ভিড় জমাট,
উৎসবের আশায় রাত জাগর।

শতেক দূরের সাততলায়
দীপমালায় সাজলো লাখ কবর,
কৃষ্ণচূড়ায় ঝড় দাপায়,
কাল সকালে রটবে জোর খবর।

ঝড়ের ফুৎকার সুর লাগায়,
অন্যগানের নিভৃত নীড়-গমক
দোসর বাতাসে ঠাসবুনন,
হৃৎপিণ্ডে অসংকোচ ঠমক।

তাকাই অবাক আজ, হঠাৎ
ছিন্নহার কঠিন ঐ গ্রীবার
মরু যে আমার চোখ ধাঁধায়
আর তৃষ্ণা হঠাৎ দুর্নিবার।

আমার কণ্ঠে সেই দহন
রাজধানীর প্রবল মেঘবহর
চিরলো বিদ্যুতের পাখায়।
পাশ ফেরে কি চিরন্তন শহর ?

অনেক আগের ফুলহারের
সব পাপড়ি ঘিরেছে জলকবর,
লক্ষ কপালে তার তবক,
বিষ-শায়কে ছেয়েছে মুখ শবর।

চাকায় চাকায় দেয় কাতার ;
এই দীর্ঘ সরীসৃপ-শয়ন
নড়বে মরণ-যন্ত্রণায় :
উন্মুখর দিনের শীত বয়ন

আমার ভেলায়; ঘুমসাগর
কলকাতার কুয়াশা মেঘবরণ
ফেড়েছি আমরা কয়জনেই,
গাই আমরা অথই শোকহরণ।

সীমান্ত

আমার বয়সের খাদে গুরুগুরু গড়ায় তারা;
প্রতিমাগুলো ব'য়ে এনেছিলাম
মাথা ভ'রে কাঁধ ভ'রে এত উঁচুতে
তারা এখন ভাঙল;
আমার চিন্তায় ভাবনায় তাদের ভাঙা হাতের করকরে চাপ,
আমার মগজে তাদের পতনের উদ্বেগ,
তাদের ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটের বাঁকে আমার আগ্রহ থুবড়ে পড়ল,
গড়িয়ে-যাওয়া মিলিয়ে-যাওয়া জোড়া উরুর আদিম প্রতাপ
আমাকে নাড়িয়ে দিল ভূমিকম্পে।
তারা ভাঙল
তাদের উল্টোনো চোখের ছোঁয়ায়
বোবা দৃষ্টি ফুটল ঢিবিগুলোয়,
কাঁটা দিয়ে উঠল ঘাসের শুকনো শীষ।

এই অনুর্বর অধিত্যকার উপর দাঁড়িয়ে আমি
ফাঁকা আলিঙ্গনে কাকে জড়াতে চাই?

একদিন কাদা থেকে পা দু-খানা জোর ক'রে উপড়ে উঠে এসেছিলাম,
হাস্যকর বসতি দু-পায়ে দ'লে
নিজের তৈরি ধাপ বেয়ে উঠে এসেছিলাম।
আমার সেই সিঁড়িভাঙার কাহিনী মহৎ কাহিনী,
দুটো মুঠোয় দুটো কাঁধে বাঁকানো কোমরে
আমার ভারবহনের সে-ছবি মহৎ শিল্প,
সমবেদনায় কাঁকে আমি গ'লে যাইনি,

ঝিরগি-হাসিতে একেলা কান্নায় জোকে উপহাসে
সকাল-বিকেলের ঘূর্ণ্ত চাকায়
সমবেত সঙ্গীতে
আমার টগবগে শিরা-উপশিরা বেজেছিল জঙ্গী বাজনায়.
আমি অতিকায় মূর্তিতে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

এক সময় থেকে আর এক সময় পর্যন্ত গহ্বরের উপর দিয়ে
যে-সব সেতু বেঁধেছিলাম
সেগুলো কিন্তু চমৎকার দেখায়,
শীতে গ্রীষ্মে এলোমেলো ধাক্কায় এখনো তারা টিঁকে আছে
গুরুভার পদক্ষেপের পর এখনো তারা গমগম করছে।

নিঃসঙ্গ অধিত্যকার পিঠ থেকে ঐ সব অতীত কীর্তি নজরে পড়ে,
সে কি যন্ত্রণা? সে কি সান্ত্বনা?
বিপন্ন শিখরে আমি দাঁড়িয়ে আছি,
নিচে তাকিয়ে গড়ানো প্রতিমাগুলো দেখি,
পরিশ্রমের আরকে জীয়োনো আমার দৈত্যমূর্তি চুপসে আসছে;
ভবিষ্যতের পটে কি একটা তিলপরিমাণ বিন্দু হয়ে আমি
লেগে থাকব এইখানে?

কিন্তু এক প্রবল শক্তির শূন্য আমাকে টানছে আর এক অভিজ্ঞতার শিখরে,
আসন্ন দিনে পাখা ভর দেবার সুযোগ পাব যেন;
ইতিমধ্যে অনুভব করছি আমার কপালের ঘাম নিঃসাড়ে শিশির হয়ে
ফুটেছে।

চিতা

চিতার আলোয় আনাচ-কানাচ ফর্সা হয়ে এল;
একটা দুর্দান্ত ভয়
যেখানে ওৎ পেতে থাকত ফুলে উঠত
মাটিতে মাকড়সার বাড়ি মারত
সেখানে কিছু নেই।

তাকে অনুভব করা যেত :
ক্ষেতের আলের কিনারে উইঢিবির কোকরে
কারখানায় মেশিনের ইস্ক্রুপের খাঁজে
ডেস্কের উপর লেজারের জাব্দা পাতায়
তার মারমুখো অস্তিত্ব গরগর করত।

প্রেমের স্তব মন্দির হয়ে উঠেছিল
কিন্তু দমকা ভয়ে ধ্বংসে পড়েছে তাসের ঘরের মতো.
তার কত যে শোচনীয় ভগ্নস্তূপ প'ড়ে থাকল ইতস্তত.
প্রত্নতত্ত্বের ধুলোমাখা পবিত্র সব গম্বুজ ;
লতার মতো যারা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছিল
তারা চমকে সাপের ছোঁয়া লাগিয়েছে,
তাদের মুখে চেরা কথার কামড়.
দেখা যাবে চেতনার বিষাক্ত দলগুলোয় তারা কিলবিল করছে।

দু-মুঠো লাল ভাতের স্বাদে চোখের জলের নুন এখনো মাখা আছে.
এই কয়েক মিনিট আগে সবাই তাতে মুখ দিয়েছে
এবং যথারীতি কুঁজো হয়ে ঘামের ফোঁটা ফেলে জমেছে এসে মশানে।

ঘানি ঘোরার টালে
লাঙলের ফালে
লোহাগলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে ? কে ?

চিটিপত্রে জমাখরচে দলিলদস্তাবেজে
কালোহলদে ডোরা
হাড়মাস চিবিয়ে-ফেলা শাসানি
একসঙ্গে পাহাড় হয়ে পুড়ছে ;
গনগনে আনাচে-কানাচে
সেই বাঁকা অস্পষ্ট দুরন্ত রেখা আর নেই,

চিতায় অবিশ্রান্ত আলোয়
এ-কোণ ও-কোণ ফর্সা হয়ে এল,
সকলের চেহারা ঝলসে উঠেছে
চামড়ায় ধরেছে টান,
আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যাশায় সন্দেহের গম্ভীরতায়
ধনুকের ছিলার মতো টনটন করছে এতগুলো প্রাণী।

কে বাঁচে?
ঘানিঘোরার টানে
লাঙলের ফালে
লোহাগলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে? কে?

বিষ
শান্ত বিষ একদিন ফেনায়।
বুকভর সাদানীল কুঁড়ি
দুলে ওঠে রংচটা ক্ষেতে
ঘনঘোর অরণ্যের কোণায়।

প্রত্যহের নিষ্পলক কুঠার
থমকায় কপালের পাশে
কাঠুরিয়া মন যায় খ'সে
খ'সে যায় বাঁধ সেই মুঠার।

মাঠের আকাশে রংবদল
আনে দূর সাগরের ছায়া,
কুঁড়ির দোলায় সাদানীলে
ঘনায় নিবিড় শূকুতল।

অনিবার তরঙ্গের প্লাবন :
আমার তৃষ্ণার কূল ভাঙে,
কায়মনোবাক্যে লাগে নেশা,
আমার ইন্দ্রিয়ে লাখ প্রাবণ।

অবনতমুখী প্রেম মাতাল,
তোমাকে ছেয়ে যে গেল জমি,
পৃথিবীর খুব সোনাগড়া,
স্বর্গ নেই, নেই আর পাতাল।

নিটোল জগতে পৌঁছিলাম,
আমাদের বাস এতদিনে
অনবদ্য হয়ে ওঠে যেন :
ফুলফল ফসলের নীলাম

বন্ধ হল ; প্রিয়মুখ-বলয়
নিটোল মুকুরখানি ঘেরে।
কোরক ফাটুক এর পরে
তেজী বিষে এসে যাক প্রলয়।

ভ্রূকুটি

সে এক হাস্যকর সময় ছিল—
আমরা রাতের পর রাত বাইরে এসে মেঘলা আকাশটা দেখতাম
আর মনের ইচ্ছাগুলো মোলায়েম ক'রে মেলে ধরতাম
যদি গুমোট ভাঙে।
খোদাই-করা ঝাপসা ভ্রূকুটি আরো জ'মে উঠত
ঠোঁটে ঠোঁটে বুকে বুকে আঙুলের জোড়ে টাটকা ক্ষতগুলোর
কানায় কানায় সমস্ত ফাঁক ভরতি ক'রে আকাশ জুড়ে থমথম
করত ভ্রূকুটি,
তার দিকে তাকিয়ে আমাদের হাঁপ ধরত।

যখন ঘরে ঢুকে বসতাম হাত-পা কুঁকড়ে
আমাদের অনর্গল আলাপে খসে পড়ত কাটা ছাত
কড়িকাঠগুলো ঝুলন্ত খাঁড়ার মতো,
আমরা পাঁজর চেপে ধ'রে হৃদয়যন্ত্রটা বাঁচাবার চেষ্টা করতাম,
আমাদের কানে কানে ঘুরত শোকসঙ্গীতের মহড়া দীর্ঘ অদম্য।

এখনো সেই ভ্রূকুটি খোদাই হয়ে আছে
বাইরে যখন আসি দেখি
কিন্তু আমরা তার প্রত্যেকটি রেখা আলাদা আলাদা ক'রে বেছে নিতে
পারি চোখ দিয়ে,
আমাদের হাত নিসপিস করে;
আমাদের শরীরজোড়া জখমের দাগ বর্মের মতো কঠিন মনে হয়।

ঘরের মধ্যে আলাপ গম্ভীর গভীরতর হয়ে জমাট বাঁধে
আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা জুড়ে গিয়ে সবুজ এক দ্বীপ তৈরি হয়
সেখানে সকাল এসে পড়ে ছাতের ফাটল দিয়ে,
আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা জোড়া লেগে লেগে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়
তার উপর ভর দিয়ে ঘরটা অটল থাকে,
আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা ফুলতে ফুলতে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়
একঘেঁয়ে গোঙানি।

যখন পায়চারি ক'রে বাইরে আসি
তাজা তাজা মৃত্যু দেখি এধারে-ওধারে।
কিন্তু কী আসে যায়?
এ-সব মৃত্যু আর মৃত্যু নয় আমাদের কাছে।
আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি জ্বালিয়ে দিয়েছি নিজেদের,
স্বচ্ছ উত্তপ্ত অনির্বাণ জ্বলছি আমরা,
আগেকার সেই বশংবদ ইচ্ছাগুলো আমাদের মধ্যে পুড়ে মরেছে দেয়ালী
পোকার মতো,
আমাদের সারা কাঠামোয় আগুন হয়ে আছে মাত্র একটি উলঙ্গ ইচ্ছা:

উপরে নিশানা ক'রে ঠিক মাঝখানে মারব হাতুর তুলে
খিঁচোনো রেখাগুলো খানখান হয়ে যাবে, একেবারে চুরমার গুঁড়োগুঁড়ো
হয়ে যাবে
তারপর ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়ে নামবে।

জাগর

এ কোন্ নির্জন ভালোবাসা
আমাকে উত্তাল ক'রে রাখে
শিখরে শিখরে রক্তে রক্তোচ্ছায় গানে ?
ফেনার তুফানে অন্ধকারে
কলার ভেলায় ভেসে ভেসে
অম্বরে জড়াই শুধু সমুদ্র উত্তাপ ;
এই কেন্দ্র-উষ্ণতায় লেগে
উঠবে কি অফুরান আলোর ফোয়ারা দাহ রাতে ?
উরুর কটির প্রান্তে তারা ঝরে দূর তারা ঝরে
শূলে-ফোঁড়া সময়ের খুলি ভরে
অজস্র বুদ্বুদে অন্ধকারে
উদ্দাম শিখরে তুলি আমি।

ঢেউয়ের পরতে আমি যে-বীজ ছড়াই
ফাটে তা ডুবন্ত চাপে,
অনেক অঙ্কুর ভাসে
জীয়ন্ত আবেগে আর আমার মুখের চারিদিকে
জ্যোতি হয়ে চায় ঝলকাতে।

যে-মুহূর্ত গ'লে গিয়ে অতলে তলায়
সেখানে গর্জায় স্ফীত রক্তের প্রপাত.
আমার নাড়ীর বেগ
অগ্নিমজ্জা ধুলো ক'রে বহমান অন্ধকার রাত ;
এ কোন্ নির্জন ভালোবাসা
তালি দিয়ে ভ'রে দেয় আকাশের ছাত ?

উন্মাদ জয়ের বিন্দুগুলি
হার গাঁথে পৃথিবীকে ঘিরে ;
জন্মান্তর উপহারে হঠাৎ কি শোভা পাবে
নদীবন পাহাড় নগর,
নির্বাসিত জন্মের নগর ?
মনে হয় রক্তের এ-উচ্চারণ যেন মিলে যাবে
জোয়ার-সমুদ্র-ঘূর্ণি-মনে,
আমার খেলার সেতুমুখে
সন্তানেরা পার হবে ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর পায়ে
রাত পুড়ে ছাই হবে তাদের পায়ের উল্কা লেগে ;

তাই কি নির্জন ভালোবাসা
আমাকে উত্তাল ক'রে রাখে
শিখরে শিখরে রক্তে রক্তোচ্ছ্বাস গানে ।

শিশুর কান্নার ঘর

শিশুর কান্নার ঘর
গড়া হয় বুকে বুক রেখে,
আদিবাস লয়ে চোখে চোখে
বলা হয় একটি জীবন্ত ভাষা
বিদ্যুতের মতো বাঁকাচোরা,
ঘুমভরা আঁধার সুষমা
দুরন্ত সাড়ার গন্ধ
বিচ্ছুরিত মশালের মতো,
পৃথিবীর দেউলিয়া মাঠে
একটি বিপন্ন ঘর গড়া হয় বুকে বুক রেখে ।

অহংকারে কৌতূহলে
দূর থেকে কাছ থেকে সমাগত মন
ব্যূহ বেঁধে ঘিরে ফেলে তুচ্ছ কোণটুকু,

আশীর্বাদী বাণী ঝরে
বোজা দুই চোখের পাতার পরে,
তারপরে প্রত্যাশার মুষলধারায়
ভাসে ঘর ভাসে তার উঠানের পথ।

আহা সে কী ছলছল রক্তের ভৃঙ্গার।

পোড়া গাছ একক শাখায়
উদ্বেগের ছায়া ফেলে দাঁড়ায় শিয়রে,
নতুন নিঃশ্বাস পড়ে বাষ্পাকুল হাওয়ার ভিতরে
তারপর জ'মে হয় ভারী ভারী ভয়ের মুখোশ :

বিদ্যুতের মতো ভাষা
ভোরবেলা হলুদ আলোয়
মিশে যায়, কাঁচা রোদে ঘরের দুয়ার
অলঙ্কারে সাজে,
ভিড় বাড়ে ;
কোটি কোটি প্রাণ
একটি প্রাণীকে চায় যে তার চরম প্রতিশ্রুতি
ঢেলে দেবে সাগরে মরুতে ময়দানে
ঘামে রক্তে প্রাণে।

আশার আদলে গড়া একটি মুখের
পরিধি বিস্তীর্ণ হয়,
নিরবধি কাল
আর নয় উদাসীন নয়
বরাভয় আর নয়,
সকালের রোদে ধরে জ্বালা,
রঙীন পেয়ালা
ভ'রে ওঠে হত্যার আস্বাদে,

উজ্জ্বল মুখের শব

মেশে গিয়ে পাথরের পাতালের খাদে

এ কী ভাষা

মৃতবৎসা পৃথিবীতে

এ কী আশা

শিশুর কান্নার ঘরে।

আহা সেই ছলছল রক্তের তৃষ্ণায়!

সুকান্ত

মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিল সুকান্ত? যে ছোট্ট বুকটা আর ছোট্ট মাথাটা অনবরত কবিতায় উথলে উঠত তাদের নিঃশব্দ শেষ ডাক শুনতে পাওয়া গেল না। আমি নিশ্চিত জানি তা একদিন হঠাৎ চিৎকার করে উঠবে। যাদবপুর হাসপাতালের মাঠ বাড়ি পুকুর তার আওয়াজে গমগম করতে থাকবে। ভালোবাসার, আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই উদ্দাম হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে। কিন্তু ততদিন আমার মাঝে মাঝে মনে হবে, মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিল আমাদের সুকান্ত? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত।

নেপথ্য

মেঘে ভারী ঘুম আচমকা বিদ্যুতে

চিরে যাবে, সেই ঝলকে দেখবে

আমার রাজ্য-নেপথ্য-মায়া,

দেখবে মাড়ানো মরা পাতাগুলো

লেগেছে তোমাকে, দূরন্ত মন ছুঁতে

তারেই ফেলেছে হাতছানি দিয়ে

কঠোর উল্লাস গুহাগর্ভের
পাতাল বিদায়, গ্লানি-পরাজয়-
সর্বনাশের মুকুট পরেছে ভুলে
আমার পিছনে সারিবাঁধা ছায়া,
দেখবে আমার মাথার উপরে
ঝরে চাঁদ ঝরে অবাক প্রেমের
শিশির রাত্রি-বিস্মৃতি-কালো চুলে।

দেখবে আমার ধ্বংসের নীড় ভ'রে
কিশোর গ্রীবার অপেক্ষা আর
অটল চাহনি চোখের কোণায়,
পাথুরে মাটিতে নাম লিখে চলে
ছুঁড়ে-ফেলা হাড় অরণ্য-অক্ষরে,
শোকমূর্তির মুখের শিলায়
অক্ষয় হয়ে রয়েছে আমার
কল্পনা মন, হাজার হৃদয়
টলটল করে যেন কোনো গোধূলিতে,
ছেঁড়া শিরাগুলি স্রোতের মতন
বয়েছে দেখবে নিরন্ন মাঠে
শস্যের বান ডাকার কুহকে
বয়েছে অবিশ্রান্ত ধূসরে পীতে।

দেখবে আমার মৃত্যু বলাকার আশা
ছেয়েছে সন্ধ্যা ছেয়েছে তৃষ্ণা-
দুর্গম হ্রদ, অঝোর পালকে
তুষারের দ্বীপে ভাস্বর এক
পরিক্রমার স্বর্গমুখর ভাষা,
আমার হাসির চূর্ণ পাত্র
হীরে বুনে দেয় অতল খনিতে
বিরল আভার সুড়ঙ্গে নেমে

ঝড়ো হয় যত ছত্রভঙ্গ পাখী,
দেখবে এমন মেঘের বেলায়
নিঃশ্বাস-চাপা কঠিন সাগরে
আমার অঙ্গের মাজারা কোড়ো
আবেগে সামনে ঠেলেছে বুকের ছাতি।

অপরিমাণে

১

হে বেগবতী নদী
আমাদের শিথান ভিজে গেল ঘরঘেঁষা বহতার চাপে।
জমাট মাটির ভিতরে দেয়ালের ভিতে কবরে
অতীত বৃত্তান্ত ক্ষমাহীন
ধ্বসে পড়ার স্পন্দন যেন মূর্ছনা.
আমাদের হাত-পায়ের জটিল জোড় খুলে গেল
খুলে গেল জোয়ারবাঁধ ফটক,
আমি উঠে বসেছি অস্ত-রঙের বিছানায়,
শোনা যায় ঘনঘটার আকাশে বিদায়ের ঘন্টা ;
কিশোর আমার কিশোর
সে যেন জোয়ান হয়ে উঠল পলকে
প্রাপ্তবয়সে বেড়ে উঠল অনিবার্য হয়ে,
মুহুর্মুহু গেরুয়া টানে
তার বুকের দু-খানা বাতা হাপরের মতো ফোঁসে.
আমি কান রেখে শুনি দুন্দুভি বাজে।

হে বেগবতী নদী
সমস্ত পৃথিবীর জঞ্জাল-স্তূপ নিঃশেষে ধুয়ে নিয়ে যাও।

২

হে বিশাল মোহনা
তোমার ডাক পৌঁছেছে বালকের কাছে,
কচি ঠোঁটে উড়ে এসে লেগেছে শীকর

রাশি রাশি শস্যকণার মতো,
পুষ্টির অপরিমেয় উৎসবের দিকে তার মুখ ঘোরালো,
ঘোলাজলের পলি ছেড়ে সামনে স্থির দিগন্ত,

ঘরদোর মুছে ফেলে বন্যা প্রান্তর ডুবিয়ে অগাধ নেই অভিমান,
জানা নেই অজানা নেই মৃত্যুর আর জীবনের ঘূর্ণির আকর্ষণে
বিস্তর বিলোপে এক হয়ে মিলিয়ে যাবার আগ্রহে
তমসার গর্ভে প্রথম অনুভব-করা জন্মদেশের আবিষ্কারে
অদ্বিতীয়
আমার কিশোর।

হে বিশাল মোহনা
ভবিষ্যতের উপকূলে বিশ্রামের স্পর্শ কি লাগে?
পীতসবুজ বিস্তার ফুলে ফেঁপে একাকার ক'রে দেয়
বালির বসতি তৃষ্ণার মরীচিকা,
উদ্ভ্রান্ত চাঁদে উদ্ভ্রান্ত সূর্যে গ্রামনগরে
পূর্ণ গ্রাসের ছায়া পড়ে।

হে বিশাল মোহনা
সমস্ত পৃথিবীর ভস্মস্তূপ নিশ্চিহ্নে তলিয়ে দাও।

আহ্বান

কখনো কখনো
মাথা তুলি পিপাসার গহ্বর ছাড়িয়ে;
তোমার অমৃত-চোখ কী দেখে তখন
কী দেখে আমার মুখে?
হয়তো মহিম স্তোত্র পাঠ করো বিধ্বস্ত কপালে,
প্রথম পাখির উষা বুঝি জেগে ওঠে বন্য চুলে
কিম্বা কোনো জ্যোতিষ্মান কথার ঝঙ্কার তুমি শোনো দুই ঠোঁটের পেষণে।

তোমার উজ্জ্বল বাহু তরঙ্গের জোয়ারে ভাসায়
দিনের অস্ত পথ সূর্যাস্ত বাসনা ;
আমি কি অবাধ্য নৌকা
আলেয়ার তীর ঘেঁষে ডুবে যাব উল্লাসের ছুঁয়ে ?
হয়তো তা জানো তাই বননীল আছ
ভুলে গিয়ে কাঁপো তুমি
শীতের গাছের মতো কখনো কখনো ।

এর চেয়ে ভালো তুমি
নেমে এসো পিপাসার গহ্বরে আমার,
তোমার অমৃত-চোখ খুঁজে পাক দিশা
অন্ধের জ্বলন্ত রোদে,
জ্বলুক নিখুঁত মিলে আমাদের সহমর তৃষা ।

একাগ্র দুঃখের তপে

একাগ্র দুঃখের তপে জটাজাল নড়ে, গ্রামচূড়া
ভগ্ননীড় অপরাহ্ণে ডাকে স্বচ্ছ ধারা
পবিত্র পত্রের পুটে, বট অশ্বত্থের ডালপালা
শোনে এক আগন্তুক কাকলির কান
ঘূর্ণির আকাশে,
মৃত্যুর মতন ঠাণ্ডা ঘাটে
রোদে ঠাঠা আকালের মাঠে
সর্পিল শিকড় ফের পেয়ে যায় জন্মের ঠিকানা ।

হাতে হাত দিয়ে ঘেরা মরা জমিটুকু
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ঘাসের ডগায়,
আধখানা চাঁদের আলোয়
কিন্তু সে-মুখগুলো
গ্রীষ্মের হাপরে জ্বলা ঠোঁটগুলো
শিশিরের ঘায়ে যেন নুড়ির মতন ঠাণ্ডা
সে-পিপাসা

ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঘুরে কোন্ এক প্রস্রবণে দিয়েছে চুমুক,
জীবন-উৎসুক
মানুষেরা দাঁড়িয়েছে পায়ের কিণাকে কাঁটা হ'লে
হাতে হাত দিয়ে মত্ত নৃত্যের ভঙ্গিতে।

দৃষ্টির অগাধ বন্যা
ডোবায় অসাড় শোক লোকসান নীলামের হাট,
অপূর্ব কপাট
যেন খুলে যায় গাঢ় অতলস্পর্শের দেশে,
চায় অনিমেষে
একটি চরম আশা আবর্তের অস্থির গহনে,
দুর্বল মন্থর কলি
দ্রুত ফেরে ঘরে ঘরে, কণ্ঠের দমকে
ঝড় মেশে,
উন্মত্ত জটার জাল ঘিরে
ফুলে ফুলে ফেঁপে ওঠে আদিগন্ত বিশাল গর্জনে।

চৈতালি

গ্রীষ্মের ধূসর ফণা দোলে
ফণীমনসার ঝাড়ে তুলসীতলায়,
ভিটেমাটি উচ্ছন্নের উজাড় চৈতালি
ওড়ায় সন্ধ্যার দেশ
ঘুমন্ত স্নেহের রাত,
নিঃশ্বাসের ঝড়ে
অমৃতসমান কথা ছিঁড়ে ছুটে একাকার,
হাহা করে বুকের আগল,
শতমূল অদৃশ্য বারণ
ঝুরঝুর মাটি ঝ'রে আলগা হাওয়ার ঝোলে দরজায় দরজায়,
গোধূলি-স্মরণ বাসা
চিন্তা যেন চৈত্রের দুপুরে,

নয় মন নয় তারা
প্রখর বিদ্রূপে তাতে পাঁজরের আকাঙ্ক্ষায় মোহের পিছনে।

তবুও আমরা মুক্ত গ্রীষ্মের কথায়
আমরা ধুলায় মন্ত্র খুঁজি ;
আঙিনায় পারে এসে দাঁড়িয়েছি, শপথের মুঠি
তুলেছি তোমার দুটি পদ্মহাত ছেড়ে,
তোমার মুখের দিকে আশা মেলে সূর্যমুখী ফুলে জেলে
প্রান্তকাল প্রান্তরের রোদমোড়া সীমানায়, সীমানা ছাড়িয়ে
সঙ্কল্প রেখেছি, দূর দূর পথে
ছড়িয়েছি কঠিন আহ্বান।

ঘরছাড়া বাতাসে
আঁচলের পাল ওড়ে, মানুষের অগাধ মোহনা
দিগন্তে কোথাও কলকল, সমুদ্র-দমক
পায়ে লাগে উড্ডীন-ডানার তালে, তোমার স্বপ্নের
গুহা এক অগ্নিগিরি, স্বপ্নের স্তবক
চঞ্চল শিখায় উঠে সকাল রাত্রিকে মুছে ফেলে,
আয়নার মতো এই হৃদয়ে তির্যক পড়ে
আলো দিন ধাঁধানো ঝলক ছোটে তীর আলো দুঃসহ মুক্তির সূর্যপারে

চতুরঙ্গ

উৎকর্ণ

রুদ্র এক রাত্রি ঠেলে বিহঙ্গের ডানা
শব্দের রেখায় পথ পথান্তর পার হয়,
বুকচাপা ঘরের ভিতর
শিহরায় আশা স্বপ্ন অন্ধকার উন্মুখ জঠর ;
নিথর উৎকর্ণ জাগি
কখন মিলবে তারা
তোরাই রক্তের সুরে জীবনের প্লাবনের রোলে।

বাঁধ

এ নির্দয় নদী
সাপের মতন ফোঁসে, লোহার নিশ্বাসে ছিনভয়
থমথম কালো মেঘ, অরণ্যের ভয়
তীরে তীরে চেপে বসে, জিঘাংসার দাঁত
কুরে নেয় মধুমূল,
আমাদের হাতগুলো জোড়া লাগে দুঃসাহসী বাঁধে,
মৃত্যুর শপথে উচ্চকিত দুর্দম বিস্তার।

স্বাক্ষর

শহরের পাথরের গায়ে দিলাম স্বাক্ষর,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ তূর্যে জাগে
ঘরছাড়া দল জমে সমুদ্র-গভীর
জমে সকাল সন্ধ্যার আগে
জমে তামাশার আসর ভাঙার আগে,
টলমল ধূসর সময়ে
স্তম্ভগুলি আগুনের শিখা
দীর্ঘ রাতে আলো পড়ে,
ইটকাঠ ইস্পাতের স্তূপে
নিশানের মতো ওড়ে একটি মশাল।

পরিখার পার

নিস্তব্ধ শস্তের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ডাক দিয়ে
দিন যায় জ্যোৎস্নার মন্ত্রের মতো,
উর্বর প্রস্তুতি
রুদ্ধ হৃদয়ের চাপে উতরোল আন্দোলনে
সীমান্তের সঙ্কীর্ণ এলাকা জুড়ে অস্ফুট চিৎকারে।

মৃত্যুহীন ভালোবাসা দাবানল হতে চায়
জঞ্জালের স্তূপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে,

তীব্র গূঢ় ক্ষত
অজ্ঞাত নির্ঝরে ধোয় বপনের কাল,
প্রতীক্ষাশেষের দৃষ্টি
দেখে এক ভবিষ্যৎ ফোটে শুভ্র বিশাল পুষ্পের দলে
শান্তির শিশির-মুক্তা-ঝলমল পৃথিবীকে দেখে।

আমরা মুঠোয় নিয়ে অবিনাশী বীজ
পা বাড়াই নিষেধের পরিখার পারে।

প্রবাসী

সাত সমুদ্রে বিলুপ্তির মাঝ থেকে তোমায় ধরলাম
আকাশ-তরঙ্গে ছড়ানো নিরুদ্দেশ পথ থেকে,
সন্ধ্যায় এক স্থির বিন্দু জ্বলে আমার দিগন্তে
রৌদ্রে জ্বলে কঠিন মণির মতো,
পাইনের হাওয়ায় বন মর্মর খুঁজে পায় :
তোমার মন্ত্র তোমার হাসিকান্না তোমার নিঃশ্বাসপতন।

বসন্তের বিভোর গান আমাকে ছড়িয়ে দেয় দূর মাটির ধুলোয়
আমার বুক দিয়ে আমি অনুভব করি দুরবগাহ স্পন্দন
বিষুব রেখার নিবিড় তাপের স্রোত,
অশ্বারোহী সেনার মতো আমার প্রখর ইচ্ছা প্রবল আশা
যাত্রা করে উন্মনা ঝিঁঝি-ডাকা ছায়াবেলায়
তারা আবার জয় ক'রে নেবে হারানো প্রিয়তম ভুবন।

নতুন মহাদেশের জঠর থেকে
এ যেন এক রক্তাক্ত সত্যের জন্ম।

নিস্তব্ধ ঘর গভীর কথায় ভ'রে সাড়া দেয় :
তোমায় ভালোবাসি।
প্রতিধ্বনিতে হৃদয় পূর্ণ আমার পাহাড় প্রান্তর মুখর
মুখর বিস্মিত অপরিচিত বিদেশ।

ধোঁয়া

ভয় হয় কানের পর্দা বুঝি ছিঁড়ে যাবে,
কোলাহলের মধ্যে ডুবে যখন রত্ন খুঁজি
মাঝে মাঝে ওই রকম মনে হয়।
অতলস্পর্শ বধিরতার নিচে শয্যা পাতা থাকে
কবরের আস্তরণে মোড়া,
বেহুঁশ বিশ্রামের তাগিদ আসে অনবরত
মাপা যায় না এমন অচৈতন্য টান দেয়।
কিন্তু কোথা থেকে আলো পড়ে,
আবছা দেখি
বেওয়ারিশ বাঁচা-মরার এলাকায় থমকে দেখি
কিছু ঝলমল করে,
কবরের চেয়ে তাকে কঠিন লাগে
অপঘাত মৃত্যুর চেয়ে তেজীয়ান ;
আমি অজস্র হাতে তাকে খুঁজতে থাকি।

এক-একবার ভয় হয় আমি ফেটে যাব ;
আজন্ম বেঁচে থাকার তাপ বোমার মতো উগ্র-বিস্ফোরক হয়েছে,
আমার একসঙ্গে আঁটো হয়ে থাকার মানে একেবারে উল্টে যায়,
মাত্র একটি দেশলাই-কাঠির মুখে উড়ে ছড়িয়ে যেতে পারি
অথচ আমাকে পাথর-ঠোকা ঝাঁক ঝাঁক স্ফুলিঙ্গ মেখে নামতে হবে।

চারপাশের আবহাওয়ার সমুদ্র গলা সীসের ঢেউ তোলে ;
আমার অনায়ত্ত রাজত্বের মুখোমুখি আমি ধ্বংসোন্মুখ হয়ে থামি,
অভাবনীয় আমূল বিস্ফোরণে আমি মিলিয়ে যাব
অদৃশ্য হয়ে যাব দায়হীন অনস্তিত্বে
এই রকম পরিণাম পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব হয়ে ওঠে ;
জগৎ-সংসারের কেন্দ্রে আমি যাবজ্জীবন উৎসর্গের শেষ নিষ্ফল
পরমাণুতে কাঁপতে থাকি।

কিন্তু কোথা থেকে ঠাণ্ডা ঝাপ্টা লাগে,
পাল্টে অস্পৃষ্ট সমুদ্রে গা-জুড়োনো স্রোত চলে
একটা প্রায়-হারানো খাতে ;
সেই প্রবাহের সীমানায় কিছু ঝলকায়,
বিস্ফোরণের চেয়ে তাকে জোরালো মনে হয়
বিলুপ্তির সমুদ্রের চেয়ে বলীয়ান।
আমি দৃক্পাতহীন ঝোঁকে নিজেকে ছেড়ে দিই।

বিদারণ

নখ বসিয়ে নিজের কল্জেটা ফেড়ে ফেলেছো
মেহময় কোমল বুক কেমন সহজে ফাঁক হয়ে গেল :
পরতে পরতে রক্তে মাংসে জড়াজড়ি
মেদে সহানুভূতিতে করুণায় অনুকম্পায় থাপি জমিন ;
রক্ত বেরিয়ে এল প্রথমে হুড়মুড় ক'রে বাঁধভাঙা প্রেমের মতো
তারপর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঝরতে লাগল যেন শাশ্বত শান্ত ভালোবাসা।

তুমি দেখতে চাও তোমার হৃৎপিণ্ড ?
এখন নখ দিয়ে তাকে ছোঁয়া যায় :
মখমলের মতো মোলায়েম
আল্তো একটু চাপ দিলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে ছড়িয়ে পড়ে
তিন কোণের নির্যাসে যেন চাঁদের আলোর বুনন টের পাওয়া যায়
অনুভব করা যায় বুকের হাড়চামড়ার চেয়ে কত বেশি নরম।
রক্তের এক-এক ঝলকে ভালোবাসা চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় আমার।

তুমি স্পর্শ করেছো কিন্তু দেখতে পাচ্ছো না,
আহা তোমার কী আকুলতা।
মাথা ঝুলিয়ে চোখ ঠিকরে খুঁজছো তুমি
কিন্তু এখনো দেখা যাচ্ছে না,
এরপর তুমি হয়তো ঝটকা মেরে ওটা উপড়ে আনবে নীলপদ্মের মতো
এবং অঞ্জলিতে মেলে ধরবে

আশ্চর্য আত্মবিসর্জনের ভঙ্গিতে ;
তার আগে প্রেমের নাড়ীনক্ষত্র একবার চিনে নেবে
এই তোমার শখ।

কিন্তু অন্ধকার ঘনাতেই আলোগুলো সব নিবিয়ে দিলে তুমি,
তাহলে বুকের ভেতরটা কী ক'রে দেখা যাবে ?

মূর্খ নগরী মূর্খ মূর্খ জননী।

হৈমন্তী

গ্রীষ্মের চড়াই ভেঙে পৌছলাম
পড়ন্ত রোদ্দুর-লাগা নীড়ের এলাকায়
পলাশের ঝলকে এখন চোখ ধাঁধায় না, তাই
তোমার শ্যামল মুখ দেখতে পেলাম
দেখতে পেলাম দীঘির মতো থইথই চাউনি।

আমি ছুঁয়েছি এক অবসরের কোণ
আমার পায়ের আঙুলে লাগে
আকাশের নীল রেশ, উড়ন্ত পাখায়-কাঁপা হাওয়ায়
হৃদয়ের ছন্দ যেন মাটির ঢেউ। আমার
ক্লান্ত আশার পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। পড়ুক।
তার সৌরভের রঙের উজাড় আলোয়
আমাদের দিগন্তকে টানতে চাই।

তৃষ্ণার প্রান্তরে চলতে চলতে
তোমার দূর গুঞ্জরন শুনেছিলাম, তা
মনে হয়েছিল কান্না,
সুরের আমেজ তাতে বুঝি এইবার লাগল।

সামনে শীতের রাত
গোধূলির রঙে জ্বালানো বাতি
রুক্ষ বাতাসে নিবে যাবে
দাঁতে দাঁতে চাপা কথা সব টলতে থাকবে, দূরে
আবার মিলোবে আলাপের মীড়।
এ-পাশে পোড়া পাহাড়
ও-পাশে হিমের শিখর
মাঝখানে এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় তুমি
স্নিগ্ধ ধারায় বও, সেখানে
আমাকে সম্পূর্ণ ক'রে প্রতিবিম্বিত করো
আমাদের উপর পাতা ঝরতে থাকুক,
ফুল ঝরতে থাকুক ঝরতে থাকুক।

এই হেমন্তের গুণে
তোমার সমস্ত মায়া
নদী হোক আজ।

ফসলের সুরে
বসন্তের পাতা আর বৈশাখের ঝড়
আমাকে উৎকর্ণ করে,
বর্ষার ঝমঝম বা আশ্বিনের ভোরের সানাই
আমাকে আচ্ছন্ন করে,
শীতশেষের গ্রাম
আমার কানে এক অপূর্ব নাম জপে।

আমি পলিমাটি ছুঁলেই বুঝি
নিজেদের জগতে এলাম।
তোমার শরীরে অঙ্কুরের শিহর খুঁজি,
আমার আলিঙ্গনের মধ্যে দুর্বোধ্য বিস্তার সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে,
আশেপাশে অসংখ্য ইশারায়

তোমার ঠোঁটের প্রত্যাশা উত্থিত হয়,
জীবনের আগ্রহে
আমার পৃথিবীময় সেই প্রতীক্ষা।

আমাদের কানে-কানে কথার সৌরভে
দশদিক ভরবে
এই আশা দিগন্তকে ঘনিষ্ঠ করে,
মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে
তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।
নদীমাতৃক দেশের হৃদয় আমাদের কাছে খোলা
তাই এখানেই ফিরে আসি
তাই তোমাকেই ভালোবাসি,
এখানে আমরা আপন হতে পারি দূর্বার মতো
কিম্বা বৃষ্টির মতো
ইতস্তত যে-ভয়
জড় শুষে নেয়
যে-মরুভূমির দাপট মেঘ উড়িয়ে দেয়
তাকে ঠেলে আমরাই ভবিষ্যৎ হতে পারি।

সমস্ত অপরিচয়ের কাঁটা দ'লে দিই পায়ে
আমার ক্ষত যেন উর্বর করে এই দিন,
বিশাল নদীতে আমাদের নিবিড় সুর ভাসাই
রোমাঞ্চিত সমতল যাতে গান গেয়ে ওঠে।
গহীন চোখের মধ্যে ডুবে
আমরা ফসলের মতো নতুন হতে চাই।
কখনো সন্ধ্যাতারার নিচে
কখনো পাখি-জাগার লগ্নে
অথবা কখনো পোড়ো ভিটের দুপুরে
তোমাকে টানি সব কানাকানি সরিয়ে দিয়ে
মানুষের আবেগে,

জরাজীর্ণ স্তিকে অস্বীকার ক'রে বলি
তুমি মঞ্জরীর মতো জাগো
বলি ধানশীষ হও গর্বের ঢেউ
বলি গভীর কল্লোল দিয়ে আমাকে জড়াও।

ছয় ঋতু সঞ্চয় করি

ছয় ঋতু সঞ্চয় করি
বছরের পর বছর জমা করি আমাদের চোখের শূন্য কোটরে.
একদিন তাদের আদলে আমরা দেখব
হাজার হাজার বর্ণহীন দিনের পর একদিন
একদিন ছয় ঋতুর আদলে তোমাদের দেখব
পৃথিবী পুত্রকন্যা
তোমাদের মুখ।
সেই যৌতুক আমরা চাই
অন্ধ জীবনের কাছে
তারই জন্যে প্রস্তুত হই।

কত যোজন জুড়ে উপুড় হয়ে থাকে মাঠ
কত কথা হারিয়ে চুপ ক'রে থাকে নদী
শহরের পথে কখন গাছের পাতা ঝরে পাতা আসে জানি না
জানি না কেমন ক'রে শিশুরা আগুন পোহায় শীতে
কেমন ক'রে
খুশিতে প্রথম আষাঢ়ের বৃষ্টি নামে
গ্রীষ্মের বেলা ফলের রসে ডগমগ হয়
বিকেলের মেঘে দেখা দেয় সমুদ্রের আভাস,
চিনতে পারি না তকতকে নীল আকাশ
কিংবা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুলের কুঁড়ি
তোমাদের আকুল শরীর
যেন ছায়া।

একটা মুহূর্তে তো তো এর বদল হবে
রক্তে মাংসে মাটিতে জলে সমস্ত মুখ সুডোল হয়ে উঠবে
কালো পর্দা সরিয়ে তোমাদের সম্ভ্রম মূর্তি নেবে
হে পৃথিবী হে পুত্রকন্যা।

অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের চোখের পাতা পড়ে না।

উৎসর্গ

ধ্বংসের প্রান্তরে হিরণ্ময় আমার ভাবনা
তোমাকে উৎসর্গ করলাম,
তোমাকে স্মরণ করলাম
রোদের জোয়ারে জ্যোৎস্নায় অনবদ্য রঙে
আলোর গন্ধ মাখিয়ে
মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে
অবিরাম গতির শিখরে,
দৃষ্টির সমস্ত আকুলতা নিয়ে
তোমার দিকে ঘুরলাম
নিজেকে উৎসারিত ক'রে সামনে উপরে সব দিকে
তোমার জন্যে ছড়িয়ে রাখলাম অভ্যর্থনা,
জানি তুমি যখন পা দেবে আকালের মাটিতে
তার হৃদয় ভরবে জলের কলকলে
অঙ্কুরের গুঞ্জনে প্রতিবিম্বে ঝলমল
আকাশের আলিঙ্গনে।

আমি চোখ খুলেই আকাশের যে-প্রান্তে
সকালকে খুঁজি
সেখানে ভারী নিঃশ্বাস জ'মে ওঠে,
এক একটা দিন যেন কবর
চাপা পড়ে হাসি ভালোবাসা,
সমবেদনার ভাষা হাতড়ে ফেরে দেয়ালে দেয়ালে,

খুশীর খেয়ালে উজ্জ্বল হবার মুখ
থমকে যায়, দরাজ গলায় স্রোত
ভাটার টানে বয়,
ক্লান্ত বেলা ধুলোয় ধূসর
সকলের অবসর করুণ দৃশ্যে ভেঙে পড়ে।

ঘুমের পর মেয়ের দল আসে
শহরের আনাচে-কানাচে
তাদের হাতের প্রদীপের ছায়া
ঘোমটায় ওড়নায় থরথর করে
তারা আসে কুয়াশার মতো
ক্ষতবিক্ষত পথে
হাটবাজারে
অস্পষ্ট বন্দরের পসরার ভিড়ে,
কে শুনবে সম্ভাষণ
আপনার জন কে চিনবে
কে কড়ি গুনবে ভালোবাসার
বুকের মধ্যে মুমূর্ষু কত অহঙ্কার
মেয়েরা আসে তাদের ঘুমভাঙা চোখের
অন্ধকার নিয়ে।

নিঃসঙ্গ চিলের ডাকে পানাপুকুরের মতো কাঁপে
মরা ক্ষেত,
আলের ধাপে ধাপে ওরা নেমে যায়
দলকে দল
বর্ষার ঢল যেন চকিতে দেখা কীর্তিনাশার পাড়ে,
জোড়া জোড়া নিটোল বুক
বোঝার মতো ভারী হয়ে আসে
শিশুদের ক্ষীণ চিৎকার
চলার তালে ওঠে পড়ে

শুধু যেখানটা ইটের পাঁজা পোড়ে শিখা ওড়ে
সেখানে এক আহামরি আভা লাগে।
নিবদ্ধ চোখ ঘুমে ঢুলে এলে
কালো চুলের বন্যা দুললে কপালের টিপে
রহস্য ঘনালে
স্বপ্নের ঐশ্বর্য উবে যায়
বিশ্রামের ভূমি এমন ক'রে উথলে ওঠে এমন ক'রে
নিবিড় মেঘে মেঘে তেপান্তরের নিরঙ্কুশ ঝড় লাগে।

বিশ্বের তন্দ্রা আর জাগরণ
একাকার হয়ে থাকে
এক অশান্ত নীহারিকা প্রসারিত
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে,
বাষ্পের পরিমণ্ডলে পৃথিবীর জন্মের মতো
তোমার মুখ জাগে,
তার উদ্দেশে আমাকে সমর্পণ করলাম।

দুপুরের সূর্য

দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো
তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
অনুভব করলাম।

বাইরে থেকে যখন

বাইরে থেকে যখন ফিরে আসি ঘরে ঢুকতে যাই
মনে হয় একরাশ খড় এখনি হাওয়ায় উড়ে যাবে
আর তার নিচে মাটি চোখের জলে ভেজা মাটি
সমুদ্রের মতো উদ্বেল হয়ে উঠবে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা কথার খুদে লেগে থাকে এক জলযোছা দুটি দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায় সে আকাঙ্ক্ষাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার। গড়বার, আদর করবার, ফুলে ফলে কাকলিতে মিশিয়ে দেবার। মিশিয়ে গেল তা এই ক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে। কতদিন তুষার-শীতল স্রোতের প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উত্তুরে হাওয়ায় সন্ধ্যাঝরা বর্ষণ। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বর্শার বিষ উত্তাল করল তার তিন সমুদ্র, এপার-ওপার জুড়ল কান্নার কল্লোল। দাওয়ায় ব'সে আর ছায়াপথে স্বপ্ন পাঠানো যায় না, হারানো তারাগুলো শুধু কাঁটা হয়ে ওঠে আগাছার ঝোপে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

পুরনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচায় আন্দোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায় যন্ত্রণার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে-ওঠা ফুঁপিয়ে-ওঠা আবেগ শরীরের সমস্ত তন্তুতে থরথর করে। সেখানে শান্তি ঝরে, না, সান্ত্বনা ঝরে না। ছেলে-ভুলোনো আসরে কাঠ-পুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গি শক্ত হয়ে থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ জন্মের উল্লাস। তার তাড়নায় আঁকাবাঁকা সুতোলি নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ বুকের তুষানলের আভায় কালো নিশান্তে পাড় বোনা, দুর্গের গড়ে সঙীনের চকমকির

ঝুলকি আর ঝাঝবাশিচায় জলদের চাউনি। আয়ো বলি চাই। অনেক তো দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাজর গুঁড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর কত। কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
কখন?

অমরতার কথা

বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।

আমার বদ্ধ বাতাসে যে-গান পাষাণ হয়ে থাকে তা ভেঙে ছিটিয়ে পড়ুক, কল্পনার স্বর সমুদ্র হোক এই আশায় আমি অথই। অবিশ্রাম অনুরণনে পাচিল ধ্বংসে যাবে, কলরোলে ভিটেমাটি তলাবে তখন ঘূর্ণির পাকে বুঝে নিয়ো কোথায় সেই বিন্দু যেখান থেকে জীবন ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যুর গহ্বরে।

কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হয়ে উঠবে। ওরা কচি পাতায় ঝিলমিল মুড়ে ঝিমোয়, ভিতরে ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরের ঝাপটানি। তবু সূর্য ডুবলে আমার চোখে বার বার ঘনিয়ে আসে বন।

ওরা আবার বন্য হয়ে উঠবে। আমার ছাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভ'রে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি যেখানে পোড়ামাটি-ইটের ভিতরে রস ছিল অমৃতের মতো।

রাতের পর দিন

ঘুলঘুলি থেকে তারার আকাশ স'রে গেল। ভেবেছিলাম আমাদের মিলিত বাহুর ধারা সেখানে উপচে উঠবে, ব'য়ে যাবে চারিধারে। কিন্তু তা হয়নি। আমার প্রত্যাশা পাথর হয়ে থাকল।

ভেবেছিলাম আমরা বাঁধ হব অন্ধকার প্লাবনের মুখে, কিন্তু বালির মতো ধুয়ে গেলাম।

তোমার চোখে তাকিয়েছিলাম, সাড়া পেলাম না। সে-প্রান্তরে আমার ডাক মিলিয়ে গেল। কোনো অস্ত্রের গণ্ডি দিয়েও তুমি তাকে ঘেরোনি।

সকাল এল। শিশিরের রূপোর মাঠ খানখান হয়ে গেল এই মুহূর্তে। আমাদের জাদু লাগলে যেখানে শরীর রাজ্য নামত, সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শক্ত মাটির ঢেলা, অসাড় নির্জন পথ।

সকাল এল। আমাদের সদর দরজার কাছে শিউলির বরফের রাশ স্তূপীকৃত হয়ে প'ড়ে। কবে একে হটানো যাবে? দুই বুকের মাঝখানে ফোটানো যাবে দিনরাতের ফুল?

এখন আলোর স্ফটিকে কত নির্বাসিত মুখের ছায়া। তাদের সকলের রুদ্ধ শ্বাসের চাপে এই স্তব্ধতা কি ফাটবে না?

হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা একবার নড়ুক।

তবু বৃষ্টির ঝঙ্কারে বাজি

মনে হয় এ-আকাশের ভর সওয়া যায় না
সবার শরীর টলে,
কোন্ অতলে পাথরের মতো ডোবে
পাখির ডাক পালক
এলোমেলো পাপড়ি।

প্রলয় ঝড়জলে আমাদের ঘর পড়ে
বাজে পোড়ে বাড়ন্ত গাছ
কাদাজলের রাস্তায় গাড়ি আর চ'লেও চলে না
চাকায় কাঁধ লাগাতে হয়
মনের যত সাধ সব যেন কাদায় কাদামাখা।

তবু বৃষ্টির ঝঙ্কারে বাজি,
মাথার উপরেই থাকে এক সর্বনাশ
তাকে দেখি অথবা না দেখি তাকে
তুচ্ছ ক'রেই বুকে ধ'রে রাখি
নীল মায়া তারপর মেঘ
তারপর বর্ষণের সৃষ্টির গমক
তারপর আবার সে-নীল।

হাসিতে বিদ্যুৎ টেনে উদ্ভাসিত হই
অথই সমুদ্রের মধ্যে পথ দেখবার সেই
একমাত্র জ্যোতি,
করজোড়ে মিনতি নয়
উদ্‌ভ্রান্ত চোখের জিজ্ঞাসা নয়
নিয়তি নয়
শুধু দীপ্যমান হয়ে থাকা
স্পন্দনে স্পন্দনে আলোর দীপকে।

পৃথিবীতে পৌঁছয় যে-অভ্রান্ত তারার রূপ
তাকে দেখেছি,
অন্ধকূপ ঘরের ভিতর থেকে
শ্রাবণের ধারা শুনেছি
তার অনুরণন আমার এই অস্তিত্ব জুড়ে।

তুফান ঘুরে ঘুরে বুক ছাপিয়ে যায় তবু
বৃষ্টির ঝঙ্কারে বাজি।

কয়েকটি কথা

আমি তোমাদের ডাকছি
তোমরা পূর্বোক্ত পার হয়ে এস
তোমাদের চ্যুতির আঘাতে আমি যেন চূর্ণ হই
তারপর বিকীর্ণ হই তোমাদের মতো।

•

আমার সামনে প্রখর বসন্ত
বসন্তের রং ফুল লতাপাতার শিখা
আমার আশার অন্ত নেই
আমি জলব পৃথিবীর রক্তে
আমি জলব সকলের চোখে।

•

এই সৌরভ আমার নিঃশ্বাস
যদিও সবুজ নিবে যায়
পায়ের ছাপ বিবর্ণ হয়ে আসে
তবু ধুলোর গভীর ঘ্রাণ
সমস্ত প্রাণ ভ'রে নবান্নের উৎসবের আহ্বান।

•

আমি গাছের রসের মতো প্রবাহিত হই
তোমাকে ফুটিয়ে তুলব
জল নড়ে না একটুও
ছায়া দোলে না কোথাও
নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাব আমি।

এক একটা শান্ত দিন

এক একটা শান্ত দিন নিয়ে বিভোর হই
তাকে মৃদু নদী দিয়ে ঘিরে রাখি
কুয়াশায় মুড়ে রাখি
ভোর-ভোর আলো কিম্বা গোধূলির গভীরে নিয়ে যাই
আমার জানাশোনা মানুষেরা স্তিমিত হয়ে হয়ে নিবে যায়

তাদের কথাগুলো স্থির হয়ে থাকে
স্থির শীতের রোদ আর ছায়া
কোন্ জলের শব্দ
নিস্তব্ধ মাঠ
মনের কপাট খুলে এই সব সংগ্রহ করি।

রাশি রাশি পাতায় আমার উঠোন ঢেকে যায়
রাশি রাশি ঘুম যেন ভর দেয়
সমস্ত চিন্তার উপর
পৃথিবী এক ছবি হয়ে থাকে চোখে
অপলকে তাকে দেখি যতক্ষণ পারা যায়
শুধু বুকের টিপটিপটুকু
তাকে পুষে যেন বেঁচে থাকি ঘুমন্ত শিশুর মতো
আর সব দূর পাখি
শীতের দিন ফেলে উষ্ণ আকাশের দিকে চ'লে গেল
তারা কী যেন ব'লে গেল
আহা আমার নিভৃত প্রাণ আমার গুঞ্জন আমার মুগ্ধ নিঃশ্বাস।

সন্ধ্যা নেমে এলে খেলাঘরে বাতি নেই
তখন হৃদয় জ্বালাতে ইচ্ছে করে মোমের মতো
শতসহস্র সন্ধ্যার ভিতরে এক নিবন্ত শিখা
তার চারিপাশে আজিকালের গন্ধ
যার দিকে ফিরে মনের আগ্রহ আস্তে আস্তে গ'লে গ'লে ঘুম হয়ে যায়।

এক একটা দিন এমন
সমস্ত তারের ঝনঝন যেন এক দীর্ঘ স্থির রেখা
সমস্ত বিক্ষোভ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
সমস্ত অশ্রু জমাট তুষার।

আর এক আরম্ভের জন্যে

আমি বিষের পাত্র ঠেলে দিয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি হাসি আর কান্নার পেছনে আমার প্রথম স্বপ্নকে ছুঁয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি অরণ্যের কাছে গিয়ে ঘাসের ফুলের উপর নত হয়েছি
অবাক হয়ে পুবের দিকে তাকিয়েছি
অবাক হয়ে ঝর্নায় সোনার রং দেখেছি
আমার আশ্চর্য হওয়ার উপহার তুলে ধরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি সূর্যের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি
প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে শুষে নিয়েছি রোদের বিন্দু
আর চৈত্র থেকে আষাঢ়ে আমাকে এগিয়ে দিয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও

আমি হাটে হাটে ভেসে এসে থেমেছি
মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি
ফুসফুসে ভ'রে নিয়েছি মহুয়ার আর ধানের বাতাস
আমের বোলের বাতাস
মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি অঙ্কুর আর কিছু নয়
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি
আমি কোলাহলের ধরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি
এই তো নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি : মানুষ
আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।

কলকাতায়

কলকাতা আমাকে ডেকে নেয়
বহুকালের ডাকে
বেনামী ভিড় থেকে টেনে নেয়
তীব্র চেনা বাঁকে,
আমি তার পাথরের উপর ফিরে যাই,
আমার পায়ের দাগে যেন
বাংলার শস্যঘন মাটি শিউরে ওঠে
তার পথে,
তার আকাশে আমি ফের পাই
কবেকার আবছা গাছের জটলা
ঘোর-ঘোর বেলায় লতা বুনো ফুল
কোনো উদ্‌ভ্রান্ত গন্ধ·দূরান্তর স্বর,
আমার গাঁয়ের বাংলা ফিরে ফিরে আসে
কলকাতায়।

কুঁড়ে ঘরে কোন্ কান্না শুনেছিলাম
সন্ধ্যায় বা শেষ রাতে
মজা গাঙের ধারে সর্‌সর্ হাওয়ায়
তা যেন কলকাতার কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপায়,
শূন্য খেতের হাহুতাশ
জ'মে জ'মে উঁচু বাড়ির মাথা ছোঁয়,
অলিগলি টলমল করে,
শ্মশানের গা-ছমছম রাস্তা যেন চ'লে আসে
কত ক্রোশ পার হয়ে
কলকাতায়।

আমি পাকা ধানের হাসি দেখেছিলাম
বুড়োবুড়ীর ঠোঁটে,
ছেলেমেয়ের মেলায় দেখেছিলাম

আলো,
তা জলজল করে
হঠাৎ কলকাতায়।

আমার পেছনে জানলাগুলো একে একে
নিবে গিয়েছিল
আবার তারা জ্ব'লে ওঠে
বস্তিতে কখনো চূড়ার কুঠুরিতে,
আমি চিনি ভালোবাসার সেই দীপ
যন্ত্রণায় চেয়ে থাকা,
যে-আবেগের ঢেউ আলের সীমানা ছাড়াত
উঠোন নারকেলতলা মুহুর্মুহু টলাত
বাধা পেয়ে ব্যর্থতায় আয়েক সময়ে
তার কল্লোল ভেঙে পড়ে
পাষাণের কলকাতায়।

কলকাতায় আমার বন্ধুরা
আমাকে অভিভূত করে,
আমার সামনের যবনিকা তারা তুলে ধরে,
তাদের অবিস্মরণীয় কথায় আমি নিবিষ্ট হয়ে যাই,
তারা আমাকে বাঁচবার কথা বলে,
ঘৃণাকে প্রবল ক'রে
ক্রোধকে প্রবল ক'রে
প্রেমকে প্রবল ক'রে
এক শুভ্র আগুন জ্বালিয়ে রাখতে বলে,
তারা বলে ঈর্ষাকে সে-আগুনে পুড়িয়ে দিতে
ছোট ছোট মনগুলো জঞ্জালের মতো সে-আগুনে ফেলে দিতে।
তাদের সেই ভঙ্গিগুলো
জ্যোতির রেখায় ভবিষ্যৎ এঁকে দেয়,
আমার বিস্মৃতি সরিয়ে

জীবনের সকালের পাখিদের জাগায়
সকালের উদ্ভ্রান্ত গন্ধ বুককোলতা জল
আমাদের দল বেঁধে বেরিয়ে পড়া বাংলার মেঠোপথে বনে।

কলকাতা আমার খুব কাছে আসে
আমি তাকে ধমনীতে পাই,
তরাই থেকে সাগরদ্বীপ তার কণ্ঠে বাজে
আমাকে তা হৃৎস্পন্দনে শোনায়।

রূপকথার রাজ্য পেরিয়ে এলে

রূপকথার রাজ্য পেরিয়ে এলে গঙ্গার কোল
সেই আপন কোল
সেই মুড়োনো নটেগাছ ধোঁয়ার প্রদীপ আর ধুলোর ঘর।

প্রত্যেক মানুষ অন্তর যে-আবর্ত তাতে ঘোরে
প্রত্যেক দিনের চাঁদ আর সূর্য
কাগজের নৌকোগুলো তাতেই ডোবে
যেটুকু আলাপ যেটুকু মমতা তাই দিয়ে আলোহাওয়া বোনা
বনের ডালপালায় যেমন বোনা
তার মধ্যে প্রত্যহ নিঃশব্দে ম'রে যাওয়া যায়
মরা ঘাসের পথে যে-আনাগোনা
তার মধ্যে উবে যাওয়া যায়।

কিন্তু মুখোমুখি পরস্পরকে অভ্রান্ত জানা যায়
নির্বিকার শুকতারার দিকে চেয়ে চেনা যায়
একখণ্ড আয়নায় মুখের রশ্মি গিয়ে পড়ে
সেখানে নিশ্চল বছরের বারোটা মাস
কিন্তু এক জীবনের আশ্বাস মূর্ত হয়
পরস্পরের দৃষ্টি তাকে প্রতিমার মতো গড়ে
যখন ভাঙে তার গুঁড়ো জলে মেশে মাটির উপর ছড়ায়

ছোট বড় মানুষ ঝুঁকে প'ড়ে খোঁজে
আবার দুটি ওঠার পরস্পরের দিকে
প্রত্যেক দিনের চলা এক প্রবাহের মতো হয়।

আমার প্রত্যাশা রূপকথা পেরিয়ে এসেছে
আমি তা বিছিয়ে দিয়েছি ধুলোয় আর ধোঁয়ায়
যে-পথ গোড়ায় তার উপর।

আমার কাছে বদলে যায়

আমার কাছে বদলে যায়
কান্নার দুটি চোখ, রাত্রি
যেখানে আরো রাত্রির দিকে দরজা খোলা,
টুপটাপ ফুল আর শিশিরের মাঝখান দিয়ে যে-নিরুদ্দেশ
তার সামনে আমার অবস্থান,
ঘন্টা বেজে বেজে যখন ঝিমিয়ে পড়ে
আমি নাড়া দিয়ে নতুন কণ্ঠ জাগাই
প্রেম আর বাসনার চিত্রপট আলোর গুচ্ছে সাজাই
তখন আমার বহু চেনা মন অন্ধকার থেকে মুক্তি পায়
বহু মিলে আমি তাদের মেলাই,
দীর্ঘ মলিন সময়
টুকরো টুকরো হয়ে যেন হীরের মতো প্রভাময়।

আমি এক পলকেই দেখে নিই
ভাঙাচোরা সমস্ত ঘর
ভরসার সমস্ত দুর্গ
কোনো বিদ্রূপের এত জোর নেই তাদের কখনো ধুলিসাৎ করে
আমার চোখের সামনেই
খুব মৃদু কথাগুলো
একটি প্রতিজ্ঞার মতো গ'ড়ে ওঠে

এক বুক থেকে আর এক বুকে
এক গলা থেকে আর এক গলায়।

আমি বিরলতম হাওয়াকে পাই
তার মুখে উড়িয়ে দিই
পিছল ভাঙা কালো জলের ঘাট
ডুব দিয়ে বুদ্‌বুদে শেষ হয়ে যাওয়া,
আমাকে আর টানে না মৃতভার
আমি যাদের আবিষ্কার করি তাদের কাউকেই টানে না
এক লঘু উজ্জ্বল বাঁচায় আমরা দোসর
এক অপার কৌতূহলে।

সব বদ্‌লে যায়
আমি বুঝতে পারি কখন মার শোক
আবার ঘুমপাড়ানি গান হবে।

তোমার নাম মিলিয়ে দিলাম

তোমার নাম মিলিয়ে দিলাম
ফসল নদী উৎসবের সঙ্গে
আমাদের রহস্য মিশিয়ে দিলাম
পরমাশ্চর্য লোকালয়ে
তুমি এবার ব্যর্থ ভঙ্গিমা থেকে বাঁচবে
দিনের আলোয় হাসবে
অথবা অন্ধকার তোমার ব্যঞ্জনা হবে
আমার যা কিছু বলার তোমার কাছ থেকে তার অর্থ পাবে

সমতলে আর দূর টিলায় অনেক কণ্ঠ
অনেক কণ্ঠ এক উৎস থেকে ব'য়ে আসে
সেই উৎসে তুমি আমাকে উজিয়ে নিয়ে চলো,

স্থানকাল পার হয়ে যত ঘনিষ্ঠ ঘর
তাদের ছায়া রোদ রংবদল নানা আকাঙ্ক্ষার মতো
আমি তা তোমার চোখে দেখব।

খোয়া মাটির উপর আসন্ন বর্ষা
ঘনশ্যাম বৃক্ষ
নয়তো অফুরন্ত ফুল বৈশাখের সামনে
তারা তোমাকে ছবির মতো ঘিরে নিক
পাতা-ছলছল শীত
নয়তো গ্রীষ্মের ধ্যান
তোমাকে বুকের মধ্যে রাখুক।

প্রতীক্ষার দীপে দীপে তুমি জেগে থাকো।

প্রতি বিদায়ে

গঙ্গা পদ্মা মেঘনা ছাড়ালে
একাকার নীলে উধাও হয়ে যেতে হয়
যেখানে হাওয়ার পারাপার নেই
দক্ষিণের বিহ্বলতা নেই
কিম্বা উত্তরের স্মৃতি।

গঙ্গা পদ্মা মেঘনা আড়াল হলে
মাটির ঝলক হারাতে হয়
দুধারে আর চিহ্ন নেই
সে-ঋতুগুলোর ফলফুলের
সে-মানুষদের আশা ভরসা ভয়ের।

তাই প্রতি বিদায়ে আমার শুভকামনা থাকে
অশ্রুর মুহূর্তটা আমি মুক্তোর মতো রেখে দিই।

ওরা পৌঁছয় না

এখন তো ধান তুলবার সময়
স্বপ্নগুলো থবকে থবকে ফুটিয়ে তুলবার,
পাথরের চিকন রং
এখনই ঝর্নায় ফেটে পড়তে পারে
অগুন্তি মিনারে
উচ্ছ্বাসের সমস্ত আলো জ্ব'লে উঠতে পারে,
বাতাসের গলায় গলা মিলিয়ে
পাতার ঝিলিমিলিতে কেঁপে
আকাঙ্ক্ষার কথাগুলো এখনই ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু এখানে ওরা পৌঁছয় না
এই ইন্দ্রজালের সামনে,
করুণ নদীতে ওরা আচ্ছন্ন
তারই কাছে যায়
পায়ে পায়ে ক্লান্তির ধারায় সে এক বিরাট সঙ্গম,
জনপদের দুর্গম কোলাহল সেই সীমায়
একটা নতুন অরণ্যের মতো ঠাসাঠাসি হয়ে ওঠে,
ওদের পেছনের নৃশংস পথে
পাখার ঝটপটানিতে বাতাস কাঁপতে থাকে
উৎক্ষিপ্ত গানের শিস তীরের মতো আকাশে বিঁধে থাকে।

শহর গ্রাম ধুয়ে ধুয়ে অশ্রুর কাহিনী যেখানে ছলছল করে
সেখানেই ওদের সমাগম
অভিজ্ঞতায় মিলে মিলে একটানা
আলো বনচ্ছায়া তিমিরের জালে জড়ানো,
কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না
জোয়ার আসবে কি আসবে না
এ-জিজ্ঞাসাও শোনা যায় না
আকাশ বাতাস প্রার্থনায় প্রার্থনায় কাতর হয়ে পড়ে।

অনেক পরে ঘোলাজলের পলি যখন থিতোয়
স্বচ্ছ মনের মধ্যে নেমে অবগাহনের ইচ্ছে জাগে
তখন ফেরার সময় আসে
দূরের আশ্চর্য যেখানে শেষ হয়
আবার সেই যাত্রার শুরুতে।

বিচ্ছেদের পথে

বিচ্ছেদের পথে আমি বেরিয়ে এসেছি
দিনের চেঁচামেচি শেষ হয়েছে এখন চলা
এখন মনে মনে রইল নাম কত কথা
নীরবতা নিভৃতি আকাশ চলা
হৃদয়কে চেনাবার জন্যে কিছু ধুলোর চিহ্ন।

রক্তজবার মতো মুঠো-মুঠো অন্ধকার আমি জড়ো করেছি
শেষ নিঃশ্বাস থেকে
আমার রক্তের উপর তা চেপে নিয়েছি।

অন্ধ চারটে দেয়াল পেছনে ঠেলে দিলাম
তারা অর্থহীন
নির্বিকার মাটি থেকে আলগা হয়ে এলাম
তাকে কখনো কি আপন মনে হত
দিনের আলো একটু ভস্মের মতোই
গঙ্গার জলে ধুয়ে গেল
তারপর আমার একলার গান আমি গাইলাম
আধ ভেঙে গেলাম কড়ি থেকে কোমলে
পর্দায় পর্দায় নেমে এলাম রক্তের সমতলে
সেই গানের মূল আমার স্নায়ুর মধ্যে কাঁপছে
শেষ আলোর রেশ আমার আঙুলে এসে থেমেছে
মুঠোকরা অন্ধকার ছুঁয়ে।

জন্ম আর পরবের পৃথিবী
তোমারই ভোরের মধ্যে আমি নিঃশব্দে মিশে যাব।

যেখানে উত্তাপ নেই

আমি বন্ধু হতে চেয়েছি
তাই দেয়ালে ঘা দিয়ে কথা বলেছি,
আড়ালের ওধারে
সঙ্কেত করেছি
প্রান্তর আকাশ আর শস্যের
মোহনায়,
আমার কথার মধ্যে নিয়ে এসেছি কত ঢেউ
ঘরের যে-অল্প আলোয় কেউ আমার মুখ দেখতে পায় না
আমি তাকে নিবে যেতে দিইনি
আমার সমস্ত আশার মধ্যে তাকে ধ'রে রেখেছি
মনে মনে সূর্যের মতো বাড়িয়েছি,
নিথর বাতাস
আমার ফুসফুসের আবেগে কাঁপিয়েছি।

তাই তো অবশেষে মৃত্যুকে বন্ধুর মতো বললাম
তুমি আমার উত্তাপ নাও
তুমি আমার দৃষ্টি নাও
পৃথিবীকে ধ'রে রাখবার আগ্রহ
তুমি আমার এই হাত থেকে টেনে নাও।

কিন্তু মৃত্যু সে কথা শোনেনি।

শস্যের সীমানা থেকে আমি এখন কতদূরে
তার কোন হদিস পাই না
আমার পায়ের শব্দ স'রে এসেছে এক গহ্বরের ধারে
তার মধ্যে তাকালে আমি অন্ধ হয়ে যাই।

যেখানে সব উষ্ণতা উবে গেল
সেখানে আমাকে এখন স্মৃতির মতো কান্না মাখবে,
আমাকে নতুন বন্ধুত্ব দেবে ?
আমি ঘুরেছি পাথর পোড়ামাটির দিকে
কাঁটাবন মাস্তিফের দিকে
বলছি আমাকে পাথর আর পোড়ামাটিতে গড়ো
আমাকে কাঁটাবন আর মাস্তিফের মধ্যে ধরো।

ষষ্ঠ ভাগ

অন্তরঙ্গ

ঠাহর ক'রে দেখে বুঝলাম এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ। প্রথম সকালটা আমি ভুলিনি। আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে সবাই বাইরে এসেছিল। মনে আছে সবুজ তোরণের নিচে আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম। বেশিক্ষণ নয়, কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের রক্তে সমস্ত দূরত্ব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আমাদের মন সমস্ত দূরত্ব নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল। কেউ একজন (আমিই কি?) হঠাৎ বলেছিল, চলো, ঝর্না কোথা থেকে বেরিয়েছে খুঁজে দেখি। হৈ হৈ ক'রে পাহাড় বন মাড়িয়ে আমরা উঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু পাইনি। অত উঁচুতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আরও উঁচুতে ওঠার জন্যে ব্যাকুল হয়েও আমাদের নেমে আসতে হয়েছিল এই সমতলে, আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে। তারপরই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। অন্য কথা আর কে শুনবে? তবু আমি নতুন বৃষ্টি, পাখি, চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম, বললাম, এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজ-খবর আমাদের দেবে। কিন্তু আমার সে কয়েকটি কথা গভীর অন্যমনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।

আমার চারপাশে তারা আবার ভিড় ক'রে এসেছে। এ-জায়গায় বিপুল জলের ভাঙন লেগেই আছে, স্পষ্টতার এলাকা এটা নয়। ভাল ক'রে দেখে তবে তাদের চেনা গেল। তাদের আলাদা আলাদা নাম আমি আর বলতে পারি না। আমার মনে হল নিঃসঙ্গতাকে যদি কোনো নাম ধ'রে ডাকা যায় তাহলে তারা সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে। তাদের মুখগুলো নিবে গিয়েছে, তাই সেখানে কিছুই পড়া গেল না। তবু আমার বন্ধুতা আমি তাদের কাছে রাখলাম, তাদের কথা জানতে চাইলাম। কোন্ সম্বল নিয়ে তারা এতদূর হেঁটে আসতে পারল এই প্রশ্ন শুনে তারা চেটোগুলো খুলে হাতের রেখা আমার সামনে মেলে ধরল। কোনো রেখা যে এমন বিস্ময় দেখাতে পারে আমি জানতাম না। আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি।

তারা সব আমার রক্তের দোসর।

কাঁটাতার

কাঁটাতারের সামনে এসে থেমে পড়তে হল। এটা পূর্ব ওঠার সীমানা। এর আগে পর্যন্ত রাত্রি আমাকে একটানা ব'য়ে এনেছে।

যে-তারাটা অসম্ভব স্নেহ নিয়ে ম'রে গেল সে আমাকে স্বপ্ন উপহার দিয়েছিল। তাই আমার চারপাশে কোনো গণ্ডি ছিল না। অজস্র কল্পনা আমাকে দুলিয়েছে; হাওয়ায় হাওয়ায় আমার স্মৃতির রাশ শস্যের মতো আন্দোলিত হয়েছে। ক্রমাগত ঢেউ ভেঙে ভেঙে আমার চোখের আলো বিকীর্ণ করেছে।

কিন্তু এবার থামতে হল। কাঁটাতারের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরি: কেবল শূন্যের চাপ। আমার নাগালের বাইরে অনেকগুলো ফুল নিবে যাওয়ার মতো দপদপ করে। একটি সুগন্ধি শরীর আমার দিকে ফেরে, তারপর ঘাসের বিবর্ণতায় মিশে যায়। গাছগাছালি সব দুর্বোধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের কথা শিকড় বেয়ে পাতালে গিয়ে সিঁধোয়।

ভূমিকম্পের আর দেরি কত? আমি অন্তিম ইচ্ছার মতো বলছি: সব কথা গন্ধ রং এই সীমানা দিয়ে ফেটে বের হোক। আমি আর না থাকি না-ই থাকলাম।

ঘুমের দরজা ঠেলে

ঘুমের দরজা ঠেলে তারা ঢুকল। কোন্ ভোরের নদীকে ছুঁয়ে এসেছে, কোন্ কচি পাতায় হাত বুলিয়ে এসেছে তার ঘোর যেন তাদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম।

বাধা পাহাড়টা পেছনে ফেলে অনেকখানি রাস্তা পাড়ি দিয়ে তারা এল। সঙ্গে নিয়ে এল আশ্চর্যরকম অন্তরঙ্গ হবার স্বভাব।

ছবিতে ভরা একখণ্ড আকাশ তারা চালচিত্রের মতো সাজিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার একটা দিন আমার সামনে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

দুরন্ত পাহাড়টাকে তারা কি ক'রে বাগ মানাল জানি না। সে কথা তারা বলল না। আমি শুধু টের পেলাম সেটা দূরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কালবৈশাখীর কথাও তারা বলল না। অথচ তাদের কপালে ঝঞ্ঝার

অনেক রেখা। বেশ বুঝলাম, তারা মাঝ-রাস্তায় ঝড়ের কেশর মুঠো ক'রে ধরেছিল আর বাঁশঝাড়ের মাথায় লকলকে বিদ্যুতের দিকে সামনাসামনি তাকিয়েছিল। কিন্তু সে-সব তারা একটুও বলল না। তারা বলল কেবল জল আর নরম মাটির কথা।

মনে আসবে

প্রজাপতি ওড়ার ছোট্ট জায়গা। হালকা আর গাঢ় কিছু রঙে হাওয়া বুঁদ হয়। গুটিকয় মাত্র কুঁড়ি, কিন্তু তারা বুঝি সারা আকাশ জুড়ে ফুটবে। নরম জমিতে কয়েকটা উল্লসিত পায়ের দাগ। কারা ছুটে গিয়ে সূর্যের আলোর মধ্যে উধাও হয়েছে।

অস্থির উত্তাল ক্ষেতটা আরও দূরে। তবু এখান থেকেই দেখা যায় কাস্তেগুলো হঠাৎ অবাক হয়ে থেমে গিয়েছে। এক প্রতিশ্রুত অপরূপ আকাশ যেন তাদের উপর। মাঠভাঙা দুরন্ত নিষ্ঠুর স্রোত থিতিয়ে সোনার দীঘির মতো হয়েছে।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। রোদের ভিতর নতুন নগর উঠেছে। বাড়ি ঘর রাস্তা যদি জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে ডুবে যায় তাহলে প্রদীপ্ত উৎসব হবে কী ক'রে? ঝাড়বাতি সাজাবার আছে, তোরণ তুলবার আছে। তারপর আবার নতুন নগর।

বড় বড় স্তম্ভের পেছনে হয়তো বন্ধুদের মুখ; তারা অভ্যর্থনা অভিনন্দন উচ্ছ্বাসের দমকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে। আমরা কেউ কারো খোঁজ পাব না। কিন্তু এ-জায়গাটুকুর কথা আলাদা ক'রে আমাদের সবারই মনে আসবে। অশ্রুর পথ পেরোতে গিয়ে এখানে সবাই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছি। একা একা।

ঘরের মধ্যে

বাইরে কেউ একজন মোক্ষম কিছু একটা বলে আর অমনি পাথুরে হাওয়া গ'লে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমার চেয়ারটেবিলে ব'সে সেটা আমি টের পাই। কিন্তু সেই আশ্চর্য কথাটা যে কী তা ধরতে পারি না। আলো নিয়েও এক কাণ্ড। আশপাশে গাছের পাতাগুলো এক সময় অসংখ্য প্রদীপ হয়ে যায়, তাদের রোশনাইয়ের একটা রেশ আমার চোখ

দুটোকে ছুঁই-ছুঁই করে। আমার চেয়ারটেবিলের উপর যে-অন্ধকারের ঝোপ তার কিন্তু নড়বার নাম নেই। কাজেই বিজলী বাতি আমার নেবানো চলে না। খরা বছরের বৃত্তান্তে যখন আমার নিঃশ্বাস আটকে আসে তখন বাইরে এক উল্লাসের জোয়ার লাগে। বেশ বুঝতে পারি মাটি হেসে উঠেছে প্রাণ খুলে। কিন্তু কোন্ মন্তরে?

চেয়ার আর টেবিলটাকে কোথায়-বা সরিয়ে নিয়ে পাতব? আমার ঘরের মধ্যে এক কোণের সঙ্গে আর এক কোণের সত্যিকার তো কোনো তফাত নেই। একমাত্র এই আশা নিয়ে আমি টিঁকে আছি যে কাঠের চেয়ারটেবিল দুটো একদিন শিকড় গজিয়ে মাটি থেকে রস টানতে শুরু করবে এবং সেই সঙ্গে আমি ওইসব আলো-হাওয়ার শরিক হয়ে যাব।

ইষ্টিশানে

ট্রেন ছেড়ে গেল। ধ্বজপতাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা এবার নুয়ে পড়েছে। লাইন দুটো তাদের চুম্বকের মতো টানছে। কিছুক্ষণ বাদে তারা সম্বিৎ ফিরে পাবে। তখন তারা কাঠের হাত-পা মেলে খটখট ক'রে আবার পুরোনো রাস্তা বাজিয়ে চ'লে যাবে।

ট্রেনটা আমার সামনেও দাঁড়িয়েছিল। একটা মৃদু জানলায় সুখ-দুঃখের অনেক রং জমছিল। আমি তাতে নিমগ্ন হয়ে ছিলাম। হঠাৎ সেই জানলা আর পাশের কপাট ঝড়ে মেতে উঠল এবং সারা কামরাটা কালবোশেখীর মেঘের মতো উধাও হয়ে গেল। অন্য কোন্ সমতলের উপর পৌঁছে তা শান্ত হবে জানি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা, তা যেন একবার ভেসে এসে ইস্টিশানের এই কোণায় একটু ছায়া ফেলে।

শেষ একটা কথা ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তারই আধ-খানা আমি কুড়িয়ে নিয়ে এখন বুকে গুঁজে রাখছি।

দু-জনকে দেখেছিলাম

গমের ক্ষেতে তাদের দু-জনকে দেখেছিলাম। পাকা শীষগুলো উঁচু ক'রে তুলে ধরেছে যেন সামনের সমস্তটা পথ তাতে আলোকিত হয়ে যাবে। চড়ুই বুলবুলির ঝাঁক তাদের হাতের নাড়া লেগে পালানোর পর সারা মাঠে তারা তাদের উজ্জ্বলতা ঢেলে দিয়েছে। যেটুকু কুয়াশা ধুতি আর

শাড়িতে তারা জড়িয়ে এনেছিল তাও আর নেই। কাছে এবং দূরে বাড়ি ঘর পাথর পুরোনো গাছের গুঁড়ি তখনও ভয়ঙ্কর হয়ে আছে, কিন্তু সে-সবে ঘেরাও হয়েও তারা এক নিবিড় উৎসবের প্রবাহ ধরতে পেরেছে, আমার মনে হয়েছিল।

আমি আশা করেছিলাম আবার তাদের দেখা মিলবে। উদ্‌ভ্রান্ত হাট থেকে বেরিয়ে এসে দুটো মুখের আদল দেখে থমকে দাঁড়ালাম। তারাই বুঝি গাঁয়ের আবছা কোণে দুখানা পোড়া রুটি সামনে নিয়ে ব'সে আছে। কিন্তু এতখানি ব্যর্থতা আমার বিশ্বাস হল না। তাই আবার এলাম ক্ষেতের ধারে। তারা নেই। সারা মাঠ খাঁখাঁ করছে। গমের যে-দানাগুলো ঝ'রে পড়েছিল সেগুলো খোঁজাখুঁজি ক'রে কয়েক জন ধুলোর রাস্তায় উঠে এসেছে। তাদের জিগ্যেস করতে তারা চিনল, উত্তর দিল: ওরা দু'জন তো সেই কোন্ কালে স্বপ্ন দেখতে চ'লে গিয়েছে।

ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে

ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে। ভালবাসার ছাঁচে গড়া তার মুখটা তখন ঠিকমতো ঠাহর হয় না। না হলেও এইটুকু আন্দাজ করা যায় সেখানে যত ব্যাকুলতা ছিল তা সে মুছে ফেলে দিয়েছে। ফতুর হয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি।

তাকে যদি জিজ্ঞাসা করো সে মন্থর ক'রে উত্তর দেবে, যেন এক নিষ্ঠুর সত্যের উদ্‌ঘাটন করছে। তার গলা শুনলে মনে হবে জীবনের অন্য এক পার থেকে সে কথা বলছে। সে বলবে: দুপুরের আগুন তার পাঁজরায় লেগেছিল, তার পায়ের তলা থেকে নদীর চর স'রে স'রে গিয়েছিল আর তারই হাতের উপর ফসলের চারাগুলো অবশেষে এলিয়ে পড়েছিল। এই অভিজ্ঞতার পর সে চ'লে এসেছে এবং যে-অটুট শীতলতা তাকে জুড়িয়ে দিতে পারে তাই চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে আছে। এ-সব কথা যতই অবাস্তব শোনাক, তার নিজের কাছে এর চেয়ে বড় সত্যি আর কিছু নেই।

ক্রমে তাকে ঘিরে জোনাকির ঝাঁক উড়তে আরম্ভ করে। তার মুখটা তখন আবছা এক তোড়ার মতো দেখায়। কিন্তু মনে হয় খুব

আলগোছে ছুঁলেও তা ঝ'রে পড়বে, ঝ'রে প'ড়ে ধুতরো আর আশ-শ্যাওড়ার ঝাড়ের ভিতর হারিয়ে যাবে।

যাত্রী

একাগাড়ির ঘোড়া পা তুলল, এখনই চলতে আরম্ভ করবে। সওয়ারীরা এতক্ষণ উসখুস করছিল, এই ভঙ্গিটা টের পেয়ে তারা জমাট হয়ে বসল। একগলা ঘোমটা টানা বউ, জোয়ান মরদ, ছেলে বুড়ো সকলে। তারা এখন যাবে কুহকের দেশে। তারা যে এই প্রথম সেখানে যাবার জন্যে সওয়ার হল তা কিন্তু নয়। বলতে গেলে এটা একরকম রোজকারই ব্যাপার। গাড়িতে উঠে তারা দোকানপাটের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে এবং রওনা দেবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। প্রত্যেকবারই তারা মনে করে গাড়িটা পুরোনো আমবাগান পাশে রেখে খরা মাঠ পেছনে ফেলে সন্ধের গোনে-গোনে পেঁছে যাবে ভেল্কির জায়গায়। এরপর বউ তার ঘোমটা সরিয়ে একটু একটু বাইরে তাকায়, ছেলেবুড়োরা গোধূলির আবির মেখে আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প ফাঁদে আর নিজের বুকের আওয়াজ শুনে দশাসই পুরুষটার নেশা লেগে যায়।

কিন্তু গাড়ি থামলে যে-জায়গায় তারা নামে সেটা ভীষণ চেনা। চোখ বুঁজে ব'লে দিতে পারে কোন কোন গাছের তলায় ভূতের মতো ছায়া জমেছে, কোথায় খোড়ো চালগুলোর উপর সীসের তৈরি একটা আকাশ নেমেছে, কোন্ দিকে বালির ঢেউ একেবারে শিয়র পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তখন আর চোখ খুলে কিছু দেখবার ইচ্ছে থাকে না, দরকারও থাকে না। চাটাইয়ের উপর ঢ'লে প'ড়ে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেই যেন বাঁচা যায়। কিন্তু পরের দিন আবার যে-কে সেই। কেনাকাটার পাট সেরে ফিরবার সময় বেলা ঝিমোনোর সঙ্গে সঙ্গে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যে-জায়গা দেখবার এত ইচ্ছে হয়েছিল সেটা আজকেই দেখা যাবে, পক্ষীরাজ ঘোড়াটা নিশ্চয় সেখানে নিয়ে যাবে, এমন প্রত্যয় জন্মায়।

সেই ঘোড়ার পা আজ আবার যেই উঠল অমনি সওয়ারীরা বিভোর হয়ে গেল। একগলা ঘোমটা-টানা বউ, জোয়ান মরদ, ছেলে বুড়ো সকলে।

মেলা।

গাঁ থেকে অনেকখানি পথ ভাঙার পর এই মেলা। ছেলেটাকে নিয়ে রওনা হওয়ার সময় তাদের ভয় ছিল মাঝখানের সীমানা যদি না পেরোনো যায়। অথচ গোটা বছরকে তারা এই দিকেই ঘুরিয়ে রেখেছিল। নইলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতো কী ক'রে? তাই মেলার জমিতে পা দেওয়ামাত্র বাপ-মার রক্তেও হুলোড় লেগে যায়। তাদের কুঁড়েঘরটা এখন দিগন্তের ওধারে ডুবে গিয়েছে, ঝিঁঝির ডাক আর লম্বা ছায়া নিয়ে গাছের ঝাড়গুলো হ'টে হ'টে প্রকাণ্ড জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আলোর জন্যে হাসির জন্যে। আর কোনো ভাবনা নেই, দৌড়ও, এক দৌড়ে একেবারে ছেলেবেলায় গিয়ে থামো।

•

ছোট্ট মেয়ের সামনে বিরাট দরজাটা হাসতে হাসতে খুলে গেল। এক মুহূর্ত তার মনে পড়ল ইন্দ্রধনুর তলা দিয়ে সে অনেকবার এইখানটায় আসতে চেয়েও আসতে পারেনি। ভেতরে ঢুকে সে-সব কথা তার মনে থাকে না। তার পরনের ন্যাতায় এখন ফুলের নকশা ফুটে উঠেছে, সারা গা জলের মতো ছলছল করছে। এখানকার স্রোতে মিশে সে মুখটা শুধু জাগিয়ে রাখে আর চোখ বড় ক'রে ছাখে। কী নেবে সে, কী নেবে? শেষকালে পুতুলগুলোর সামনে এসে তাকে থেমে পড়তে হল। এই তো সে এতক্ষণ খুঁজছিল। দুটো মাটির পুতুল তুলে নিয়ে সে আহ্লাদে আটখানা। আর কিছু তার নেবার নেই।

ছেলেটা তাকে দেখেও ছাখেনি। স্রোতের টানে এক সময় কাছে এসেছিল, কিন্তু তাকে চিনত না, চিনলে চিৎকার ক'রে ডাকত। একা একাই সে তার ব্যাকুলতা নিয়ে ভেসে বেড়িয়েছে। ভাসতে ভাসতে দিশেহারা হাত বাড়িয়ে পেয়ে গিয়েছে একটা তালপাতার ভেঁপু। তখন তার খুশি আর ধরে না, যেন মুঠোর মধ্যে জাদুমন্ত্র পেয়েছে।

•

মেলা থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথই ধরতে হয়। বয়সের আর গাছপাথর নেই বাপ-মার। ধুলোর উপর ভারী পা ফেলে ছেলেকে নিয়ে তারা ফিরে চলে। তার হাতে তালপাতার ভেঁপু, সেটা সে একটানা বাজায়। পুতুল বুকে আঁকড়ে একটা মেয়ে অন্য পথে গিয়েছে,

আওয়াজটা সে শুনতে পায় না। কিন্তু একদিন পাবে যখন এ গাঁয়ের হাওয়া ও গাঁয়ে পৌছবে। তখন সে আকুল হয়ে কাছে আসবে। তারপর হাওয়ার জাদু ফুরোলে মেলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দুজনে দিন গোণা শুরু করবে।

একটি দোকান

কেরাসিনের কুপি ধরিয়ে দোকানটা তারার মতো ফুটে ওঠে এবং চারদিক নিশুতি হয়ে যাওয়ার পরও মিটমিট করে। অন্ধকারের মধ্যে তার কথা বলা খুব নিচু পর্দায় বাঁধা, সমস্ত স্নায়ুকে উন্মুখ না করলে তা হারিয়ে যায়। তা-ই করতে হয়। এমন এক মর্মান্তিক বিন্দুতে তার স্ফুরণ যে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বিস্তর লোক রোজ ঢেউ ঠেলতে ঠেলতে তাকে খুঁজে নিয়ে পথের একটা আন্দাজ করে। যদিও কোনো অমোঘ আশীর্বাদ তাদের উপর ঝরে না তবু এটা স্পষ্ট যে ঐ ইশারাটুকু না থাকলে তারা তলিয়ে যেত।

চারদিকের দূরত্বকে মাপবার চেষ্টা করা এক বিড়ম্বনা। এতগুলো এলোমেলো দিন সেখানে তোলপাড় করে যে কোথায় তার আরম্ভ আর কোথায় শেষ তা স্মৃতিতে বা চিন্তায় ধরা দুঃসাধ্য। খুদকুঁড়ো তেলনুন কাঠের টুকরো এই সব হাতে নিতে গিয়ে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই চিহ্ন গুলো ব'য়ে নিয়ে জীবনের তীরে পৌছোনো যাবে কি? সোনার ভাঁড়ারে এ সব জমা ক'রে দেবার সময় থাকবে কি?

কারো জানা নেই ঠিক কতদূরে সেই ডাঙা যার উপর জয়ের তোরণ উঠবে। নজর সে পর্যন্ত চলে না। কেরাসিনের কুপিটা যদি উল্টে প'ড়ে আকাশময় আগুন লাগায় তবেই তা দেখা যেতে পারে মনে হয়।

একটি গলি

পাড়ার মধ্যে দিয়ে এই গলি। বড় রাস্তার উপর যেখানে ইঁট আর পাথরগুলো প্রচণ্ড ক্ষমতায় ফাটো-ফাটো সেইখানে মুখ বাড়িয়ে নিঃশ্বাস নেয়। মার খেলেও মুখ সরায় না, কারণ বাতাস টানবার ওই একটাই পথ।

গলিটার এই একগুঁয়েমি আছে ব'লেই বাসিন্দারা সবাই মিলে

হঠাৎ ম'রে যায় না, পর পর একটু-আধটু সাধআহ্লাদের ইচ্ছে নিয়ে বাঁচে। তাছাড়া সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর কথাও তারা ভাবতে পারে। পাড়ার ঠিক গা ঘেঁষে পাহাড় আর মাঠ আর মোহনা এসে জড়ো হয়েছে এমন ইঙ্গিত তারা রোজই পায় যখন আচমকা হাওয়া পচা দরজার পাল্লায় নাড়া লাগিয়ে চম্পট দেয়।

এমনিতে খুব নরম হয়ে থাকে গলি। একটু কান্নার জলে একেবারে গ'লে যায়। মানুষগুলো বেশ অনুভব করে এই কোমলতার ভিতরে তাদের ঘরদুয়োর কত নিচে শিকড় ডুবিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই-ই সব নয়। মাঝে মাঝে একটা দারুণ ওলটপালট ঘটে। ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে সকলে এমন আলোড়িত হয় যে উদ্বেগের আর কোনো অবসর থাকে না। সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এক্ষুনি ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে বানাবে। দিনের আলো ফোটার দরকার নেই, পায়ের ঠোকায় যে চকমকি জ্বলবে তাই যথেষ্ট। পাষাণে বুক বাঁধে এই গলি। তখন একে আর চেনাই যায় না।

বাড়ি

চুনবালি খসার বিরাম নেই। ইঁটের জিরজিরে পাঁজর সামান্য একটু নিঃশ্বাস নিলেও ন'ড়ে ওঠে। ভেতরটা আর ঢেকে রাখতে পারে না। কাঠের আঁশগুলো আস্তে আস্তে ছেঁড়ে। সরু ফাটল বেয়ে বুক থেকে রক্ত চুঁইয়ে নামে। এবং একটার পর একটা ফোঁটা সমুদ্রের মতো কোলাহল করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পোড়-খাওয়া জোয়ানবয়সী চেহারাটা চৌকাঠের উপর স্থির হলে ছবির তন্ময়তা আসে। জ্বলন্ত বেলা তাকে অনবদ্যভাবে ধরে, এমনভাবে তাকে ফুটিয়ে তোলে যে মনে হয় তার ব্যর্থতাই এক অক্ষয় মহিমা। ঝিঁঝির ডাক এসে ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত তার একটা রেখাও ভাঙবে না। ততক্ষণে ঘাসগুলো আরও শুকোবে, উচ্ছেপাতা আরও হলদে হবে আর লাঠি ঠুকঠুক-করা বুড়ি দরজার ফাঁক দিয়ে একশোবার বাইরে তাকাবে।

সূর্যাস্ত যে এত কাছে তা ভাবা যায় না। হঠাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যার টান এসে লাগে। তখন সামাল-সামাল। ভিত পর্যন্ত চড়চড় ক'রে ওঠে। বাড়িটা নোঙর ছিঁড়ে বুঝি ভরাডুবির দিকে ভেসে যাবে।

করবার কিছু নেই, শুধু নড়বড়ে দেয়ালের মধ্যে মেঝে আঁকড়ে শুয়ে থাকো। ওর উপরই তো একদিন মা তার কোলের শিশুকে সম্রাট মনে ক'রে শান্তি পেয়েছিল।

রিক্‌শাওয়ালা

রিকশার চাকা দুটো ঘুরতে ঘুরতে এইখানটায় এসে দাঁড়ায়। আমার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে। যে-লোকটা চালায় একদিনও তার কামাই নেই, এই বিষম ঠাণ্ডাতেও না। এমনিতে তাকে দেখে আমার চেনার কথা নয়, কারণ তার মুখটা যেন রোজই বদলায়। চাকা দুটোর ঘোরা থেকে চিনি।

সন্ধের পর ছেলেবউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। কোন্ মহল্লা থেকে তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, ভুতুড়ে আলোগুলো পার হয়ে গেলে এক প্রকাণ্ড যে শীতের রাত পড়ে তার ওপারে সে থাকে। যেখানেই থাকুক কিছু আসে যায় না। আমার বাড়িটা যে তার চেনা, আমাদের দু-জনের পক্ষে এটাই বড় কথা।

শীতের ঢেউ যে-সব রাস্তায় আছড়ে পড়ে সেই সব রাস্তা দিয়ে রিক্‌শা চ'ড়ে আমি অনেকবার গিয়েছি। তখন মানুষটার মধ্যে আগুন গনগন করতে দেখেছি, মনে হয়েছে তার অগ্নিমজ্জা জ্বলছে। আমার গায়ে সেই আঁচ এসে লেগেছে। তার সুতীর ফতুয়াটা তখন তীব্রভাবে উড়তে থাকে এবং আমার ভয় হয় আমার গরম জামাকাপড় বুঝি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবে। কিন্তু না, প্রত্যেকবারই সে ভুতুড়ে আলোগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাকে আবার এইখানে ঠিকমতো পৌঁছে দিয়েছে। এমনকি তার বাড়িটা যে একসময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, এ অনুভূতিটাও আর লেশমাত্র থাকেনি। আজও সে আমাকে নিয়ে শীতের রাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং নিরাপদে আবার ফিরিয়ে আনবে।

খুব সম্ভব কোনো একদিন সে আসতে পারবে না। ভেতরের আগুনটা নিবে গিয়ে সে ঠাণ্ডায় জ'মে পাথর হয়ে কোথাও প'ড়ে থাকবে। কিন্তু তা ব'লে রিক্‌শার চাকা দুটো তো মাটিতে গেড়ে যাবে না। তারা আবার ঘুরবে এবং তাই থেকে আমি বুঝব সেই

রিক শ্যাওলা হাজির হয়েছে, এখন যেমন বুঝি। এটাই আমার কাছে এক স্বস্তি।

শরতের ভোরের সীমানায়

আমার চোখের মণিতে এক নিবিড় রোদ আমি নিয়ে এসেছি। জল ঝ'রে গেছে, শ্যাওলায় অন্ধকার ফিকে হয়েছে। কুঁড়ি বাকল ভাঙা হাজার মুখ আমার দিকে উসখুস করে। যেন আমি এক ঝলকে অবাধ আকাশ মেপে ধরব।

অথচ ভালো ক'রে যদি দেখ আমার শিয়রে ঝড় জ'মে আছে। দিগন্তে আমার যে-হাত রেখেছি তার উপর জলের ভার। আমার দৃষ্টির ভিতরে আকুল সংসার, কীর্তিনাশা, আচমকা ঘুম ভাঙার পর নিরুদ্দেশ মিছিল। এত বছরের।

শরতের ভোরের সীমানায় আমি অন্ধ এক ইতিহাস ব'য়ে এনেছি।

এইবার শান্ত হলো

সারাদিন ধ'রে হাপর ফুঁসেছে। এইবার শান্ত হল। আমি ঠায় সামনে ব'সে এই সময়টার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। অনেকেই আমার কাছে এসেছে এবং অবাক হয়ে আমাকে দেখেছে। তারা মনে করেছে আমি আগুনে ঝাঁপ দেবার এক পতঙ্গ, জ্ব'লে যাওয়ার আহ্লাদে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি। আমার শরীরে মেঘের নেশা তারা টের পায়নি। সুতরাং বিশ্বাস করতে পারেনি এই সময়টা পর্যন্ত আমি টিকে থাকব।

তাপ ছেঁকে ছেঁকে আলোর ছোপ আমি আপাদমস্তক মেখেছি। তোমার অন্ধকার লেগে তা ক্ষত হবে ব'লে। আমার চামড়ার নিচে যে-মৃত্যু থমকে রয়েছে তার পটভূমিতে এই আলো তোমার সামনে ধরব ব'লে।

আমার আলস্য নিয়ে মেঘের খেলা একদা আমি দেখেছিলাম। প্রসন্ন মাটি দেখেছিলাম। তারপর আর তাদের সন্ধান নেই। কিন্তু ব'সে ব'সে আমি ভেবেছি সমুদ্র তো আমার চেনা, তার বাষ্পের হাওয়ায় আমি ছড়িয়ে গিয়েছি। ভেবেছি ঘুমন্ত সব বীজ আমি ছুঁয়ে আছি। তাই অপেক্ষা ক'রে থাকা গেল।

ধুলোর স্ফুলিঙ্গগুলো এখন নরম হবে, তোমার মন্তরের জন্যে স্থির হয়ে শোবে। ভোজবাজি কখন শুরু হয় সেই আগ্রহে আমি কতবার যে তাদের মুঠোয় ধরেছি আর ফেলে দিয়েছি তার ঠিক নেই।

এবার এসো। ঝরোঝরো বৃষ্টি নিয়ে তুমি এসো।

এই প্রান্তে

এই প্রান্তে উচ্ছন্ন ঘর। আমাদের আওয়াজ ঝাউয়ের হাওয়ার সঙ্গে ফেরে আর নদীর ধসে নামে। সে এক ভাষণ নির্জনতার স্বর, অথচ আমাদের সব ঘনিষ্ঠতা তার ভিতরে।

মেঘের মস্ত নিশান ওড়ে, তার উপর আমাদের তপ্ত মুখ আঁকা। সেই শোভাযাত্রা দেখে-দেখে-ক্লান্ত চোখ আমরা নামিয়ে নিই। তারপর মুখ দেখবার জন্যে আমাদের শুকনো ভাঁড়ার তাত থেকে স্ফুলিঙ্গ বের করি।

আশা আর অনুশোচনার অসহ্য ভার আমরা ধূধূ মাঠের উপর ছুঁড়ে দিই। আমাদের ছিটোনো স্ফুলিঙ্গ লেগে তা পুড়ুক।

স্বর্গের দিকে যে-হাত দুটো বাড়িয়েছিলাম আমি তা আবার তোমার কাঁধের উপর রাখি। আমার স্পর্শ নিয়ে তুমি পাথরমাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাও, যেখানে চিরকালের মত আমি তোমায় ঢেকে থাকব।

সব ভান আমরা খসিয়ে ফেলি।

এই প্রান্তে আমরা উজাড় হয়ে যাই। এই প্রান্তে।

অথই জলবাতাসে আলোর সমুদ্রে

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তোমার উপর পড়লে তুমি কানায় কানায় ভ'রে উঠতে, পড়ন্ত বেলায় একটুখানি রোদ তোমায় ছুঁলে তুমি সোনা হয়ে যেতে, দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিলে তুমি মর্মরিত হতে। এবার তুমি দিনের ভারে চুরমার হয়ে গেলে। তোমার হৃদয়কে কুড়িয়ে নিয়েছে অথই জল বাতাস আলোর সমুদ্র। তাদের মাঝখানে আমাদের এই ঘরটা আমি পাল তুলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

নীরবতায়

শুকনো ঘাসপাতার নিচে আশ্চর্য নড়াচাড়া।
আমাদের হারানো স্মৃতির মতো,
রাত্রি খুঁড়ে জলের ধারা ছুঁতে হবে,
এলোমেলো ছায়ায় ধূসরে সবুজে
আন্দোলিত আমরা দু-জন।

*

এত কথা বলা হল
বছর ঘিরে মাস ঘিরে মিনিটে মিনিটে
তবু আমরা অন্যমনস্ক
এত চিৎকার শুনেও শুনিনি,
তোমার প্রেম আমি রেখেছি
নিস্তুত চোখে দুপুরের কোলে নীরবতায়
সম্পূর্ণ নীরবতায়।

*

একটা আলো নিয়ে কেউ হাঁটছিল
কোথা থেকে কোথায় জানি না,
তুমি হাসলে
তোমার ঠোঁট যেন দিগন্তে আঁকা হয়ে গেল,
তার দিকেই আমরা চলেছি,
আমার আঙুল তুমি দেখতে পাওনি
কিন্তু তোমার মন তার স্পষ্ট ছবি ফোটাল।
সে তো আমাদের ইচ্ছারই দিগন্ত
প্রত্যেক মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে চলো চলো—
তারপর আর কোনো রেখা নেই
তারপর অপূর্ব নির্জন সমারোহ
আমাদের অন্ধকার মুখের উপর খালি শিশির।

*

তোমায় এতদূর আনলুম,
কোথাও কোনো রাস্তার নাম লেখা ছিল না

তবু প্রশ্ন করার কথা তোমার মনে হয়নি।
এসো এবার আমরা অপলক চেয়ে থাকি
সমস্ত ঋতুর জানলা দিয়ে
যদি হঠাৎ দেখা যায়
ভয়ভাঙা সুন্দর মাটি।

ছায়ায় আলোয় চিহ্নিত

আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে
প্রখর নদী দিনের জোয়ার
টলমল নৌকো
ঋতুর পর ঋতুর পথ
অস্ফুট চারা থরে থরে পাপড়ি
মাঠের বিস্তর ক্রোশ
তারপর দিগন্ত
শূন্যে কাঁপা-কাঁপা কুটীর
উধাও জ্যোৎস্না
দেয়ালঘেরা ঘুমের স্তূপ
শিশির আর বৃষ্টির সমতল ?

আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে
হৃদয়ের কাছে আচ্ছন্ন হৃদয়
উঁচু থেকে উঁচু গ্রামে টানা তার
অন্ধকার স্নায়ুশিরা
আর কয়েকটি কথার প্রতিধ্বনি
রাত্রির চূড়ায় চূড়ায় ?
কোথায় নিয়ে যাবে শেষ পাখির ডাক
ডালপালার সাড়া
রোদের বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা ?

•

আমি এই বলি সন্ধ্যা হল

এই বলি চোখ মেলো ভোর
আমি এই দুপুরে থামি এই মাঝরাতে
ছায়ায় আর আলোয় আমাদের চিহ্নিত করি,
উৎসবের জন্তে অনেকগুলি শিখা
ধোঁয়ার কুণ্ডলী সেই অনেকগুলি শিখা,
একটি বাসার খড়কুটো হাওয়ার ফুঁয়ে উড়ে যাবার আগে
সোনার মতো জলজল করে,
দীর্ঘ উজ্জলতার পথ ধ'রে
আমাদের দেখা এক-একটি নক্ষত্র লুপ্ত হয়।

সময় ধীরে ধীরে পোড়ে
আমার চলাফেরা খুব সন্তর্পণে
মনে করি জলমাটির মিল
এইবার বুঝি উদ্ভাসিত হবে,
আমার নির্জন টহলে তোমার সাক্ষাৎ পাই
প্রথম পৃথিবীর মতো তুমি
জল থেকে জাগা
উর্বর আকাঙ্ক্ষায় উচুনিচু,
তখন আমার রক্তে রেণু-রেণু সূর্য,
যে-আওয়াজ দূরের হাহাকার হয়ে যাবে
আমার মনের মধ্যে তা মৃদঙ্গের মতো বলে।

আমি শিকড় দিয়ে মাটি বাঁধি
কত ফুল তুলে দিই আকাশে
ফসলের শীষ
ফলের উপর আমার মুখ প্রতিফলিত দেখি,
ভাঙনের ধারে আমি অসীম মায়ায় মুগ্ধ হয়ে দাঁড়াই,
শেষ আলো লেগে কাঁকরগুলো যেন মুঠো-মুঠো মণি
আমি দুই হাতে তা কুড়োতে চাই।

ঢেউ স'রে গেলে ফেনার রাশ
সব বুদবুদে আমি তোমার নাম ভ'রে দিই
তারপর দেখি তারা একটা-একটা ক'রে ফেটে যায়
আর সেখানে আমার ছায়া ঘন হতে থাকে।

আমার মুখে তাকাও

আমজামের গাঁয়ে চুপিচুপি
লাখো হাতের তল্লাস এড়িয়ে চুপিচুপি
আমার স্বপ্নগুলোকে আগলাই
বছরের চাকায় তারা গুঁড়িয়ে যাবার মতো হয়
তবু প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখি।

আগডাল থেকে বোল ঝরে
একটা দুটো তিনটে অগুন্তি
আমার বুকের শব্দ মাটির মধ্যে
ফল পাকার তাপ আমার বুকের মধ্যে।

চাতকের পাখনায় নীল উছলে পড়ে
আকাশের নীল আমার সারা অঙ্গে
বেলা গড়িয়ে যায়
গোপনে গোপনে মেঘের সঞ্চার
আমার মনে মনে।

শীতের আগুন থেকে কয়েকটা আঙার
আমি তুলে রাখি
যদি আবার তাদের জ্বালানো যায়
আরেক শীতে।

ভোর না হতেই যে-মানুষগুলো বেরোয়
তারা ফিরে আসে না

যদিও তাদের চাপা গলার কথাগুলো
কুয়াশার মতো
মাঠের এধারে ওধারে ভেসে বেড়ায়।
তাদের জন্যে প্রতীক্ষা শেষ হয় না
আমার স্বপ্নের দিগন্তে তারা হাঁটে।

সব আলোড়ন ধরাছোঁয়ার মধ্যে জড়ো হয়
সব আলোড়ন নিঃশব্দে আমার নির্জনতার ভিতরে।

তোমার শোকতাপের মুখখানা তোলো
আমার মুখে তাকাও।

এইটুকু আলোর বৃত্ত

এইটুকু আলোর বৃত্ত
তার বাইরে উৎকণ্ঠা জমেছে
এইটুকু জায়গায় কেনাবেচা হাজার কথা
পেছনে স্তব্ধ হাওয়ার দেশ
নিঃশব্দ পাতাখসার শূন্য।

বীজধানের জমি শিউরে শিউরে উঠছিল
এখন নিথর
যারা তার গায়ে আদর ক'রে হাত রেখেছিল
তাদের রক্তে সেই স্পন্দন এখনো জড়িয়ে রয়েছে।
তারা এই সীমান্তে এসে ঘনিয়েছে
এমনিভাবেই কি থাকবে তারা
প্রহরের পর প্রহর
যতক্ষণ না ঘাসের উপর শিশির জমে
পাখির ডানায় আকাশ কাঁপতে আরম্ভ করে ?
নাকি তারা এমনিভাবে থাকবে
যতক্ষণ না ঝড় আসে
এক ফুঁয়ে সব একাকার হয়ে যায় ?

দুটো সুডোল বাহু ধানের মঞ্জরীর মতো ঝলকে
নদীতীরের প্রকাণ্ড অবকাশ ভরিয়ে দিতে চেয়েছিল
সেই আবেগের ছবি কখন ভেসে গিয়েছে কালো জলে,
মেয়েটা তারপর প্রেম নিয়ে বারে বারে এল
কেউ তার দিকে গভীর ক'রে তাকাল না।

একান্তে

ওই কোণে

ওই কোণে আমার নজর রয়েছে,
বিশালতার জন্যে অস্থির হয়েও আমি বেরিয়ে পড়িনি
সাত সমুদ্দুর আমাকে হাতছানি দিয়েও টানতে পারেনি,
যন্ত্রণা ক্ষোভ আলোড়ন
বারো মাসের টালমাটাল
সব ওই কোণে জমা ক'রে দিয়ে ব'সে আছি,
ওখান থেকে নদী বইতে পারে।

যে এসে জাগায়

রাত্রির খাড়া কিনার ধ'রে চোরা পথ :
আমার যে সন্তর্পণে এসে জাগায়
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু তার মুখে ভোরবেলাকার মুক্ততার সৌরভ,
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু আমার করতলে
দিনের দূর উৎসের অনুভব।
আমার সব ছত্রভঙ্গ কথা এক দীপ্ত রেখা খোঁজে
যেখানে তারা ধুলোর মতো নাচবে।

ঘরে

দিনের জানলাটা কোন্ সময়
এক মস্ত কালো আকাশ হয়ে গেছে,

আমি ভয়ে ভয়ে ওড়ার আওয়াজ শুনছিলাম
আমার নাড়িতে শুনছিলাম সূর্য আলোর ধাক্কা
হঠাৎ সব চুপচাপ রংমোছা
কখন নিঃসাড়ে বৃষ্টির ছাউনি পড়েছে চারধারে।

আমার জ্বরের বিছানা থেকে ডাকি
ধুকপুক পাখিটাকে,
বিকেল তাকে সোনার জালে ধ'রে
অন্ধকারের মুঠোয় রেখে গেছে,
সে বুঝি এখন পলকা ঘুম আঁকড়ে রয়েছে,
আমি ভাবি অতটুকু বুক
এবার কি বিদ্যুতে দাগা হবে ?
উঁচু পিচ্ছিলটা যেখানে মেঘের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়েছে
সেই দিকে তাকিয়ে কাঁপি।
তাকে ডাকি,
এই তো তার সূর্যকে আমার এখানে বিছিয়ে রেখেছি
আমার হাতের আড়ালে তার শস্তের কণা জমা করেছি
তার ছায়াবটের ঝুরি
আমার মাটিতে নামিয়েছি।

বাঁচবার সাড়া যদি আসে সেজন্যে আমার অস্ফুট হৃৎপিণ্ডের উপর
করতল রেখে আমি উন্মুখ হয়ে থাকি।

নিস্পন্দ শিখার সামনে
ঘুরন্ত পৃথিবী স্থির হয়
এতদিনের তাড়াহুড়ো শেষ।
শীতের গলি থেকে বেরুলেই যে-প্রান্তর
সেখানে আর আমাদের পা পড়বে না,
এক ঋতুর আয়ু নিয়ে ফুলগুলো
অন্য চোখের জন্যে হয়তো অপেক্ষা করবে,

ঝড় পার হলেই যে শোনা যেত
আকুল বৃষ্টি ঝরছে
দুজনের কেউ সেদিকে আর কান পাতব না,
হলদে ঘাসের পথ কিম্বা বাঁধানো সড়ক আমরা ভুলি,
ক্রমাগত চোখ বেঁধে চলার প্রেরণা
আমাদের রক্তের মধ্যেই মরে,
প্রহর দণ্ড পল অনুপল স্তূপীকৃত হয়
তার নিচে আমাদের সব উদ্বেগের কবর।

প্রদীপের শিখার সঙ্গে এতদিন আমরা কেঁপেছি
তার ছায়ার পাকে পাকে নিজেদের জড়িয়েছি,
আর সে নড়ে না,
আলোর হিজিবিজি থেকে বেরিয়ে আসে
আমাদের পুরো চেহারা
আমাদের সেই চেহারা যা অনবরত বদলাত
ছোট্ট একটু জায়গায় দুমড়ে মুচড়ে থাকত,
নিষ্পন্দ শিখার সামনে আমরা এখন স্পষ্ট
আমরা অবাধে ছড়ানো,
যে-যন্ত্রণাগুলো চেনবার জন্যে আমরা অস্থির ছিলাম
তারা এখন যেন পাথর কুঁদে বের-করা,
যে-বন্ধুত্ব হৃদয়ের গহনে রেখেছিলাম
তা এখন আশ্চর্যরকম প্রত্যক্ষ।

তোমার আমার দুঃখের শরীর আলো ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

অন্ধের মতো
একলা টিমটিমে লণ্ঠন
অন্ধের মতো হাতড়ায়
পথগুলো যেন থমকে গিয়েছে
জলের কলকল ছাড়িয়ে অনেক উপরে।

কই সে-নদীমেখলা
মুক্ত কামনার বাঁক
মাটির ভরাট ইশারা
কোথায় ?

কোথাও শস্য বাড়ছে
ধুলোবালি কাদায় আমার রোমাঞ্চ ছড়ানো রয়েছে
অন্তরঙ্গ গাছ আমার দিকেই মাথা তুলে আছে
পাথরনুড়ির ফাঁকে ফাঁকে নতুন চারা
যেমন আমি দেখেছি আমার আকাঙ্ক্ষার চোখে,
নিচে আরো নিচে উথলপাথল
জন্মের অফুরন্ত আবেগ।

যেখানে বীজ পড়ে অঙ্কুর তৈরি হয়
সেখানে আমি কেমন ক'রে নামব ?

একই তৃষ্ণায়

বারম্বার একই তৃষ্ণায়।
করুণ বিদায় নিয়েছিলাম শৈশবের কাছে
সেই শৈশব
যখন আমার উচ্ছ্বাস নিয়ে সবুজ পাতা
আমার চোখ নিয়ে আকাশ
আমার কণ্ঠ নিয়ে নদী
যখন প্রত্যেক অন্ধকার থেকে আমার জন্ম
বিস্ময়ের মধ্যে ;
এই পৃথিবীকে এক শিশু
জুড়ে জুড়ে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছে
তার স্তব্ধ কথা আর অনর্গল নিঃশ্বাসের ভিতরে
তার অস্থির ঘুমের ভিতরে,
কিন্তু ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে তা ছোঁয়া যায়নি,

মানুষের আকাঙ্ক্ষায় তপ্ত লোহা
তার স্নায়ুর উপর থেকে গেছে।

যৌবনের শরীর যেন সমুদ্রে জরোজরো,
জলের ঝর্ঝর তবু আমার জোয়ান বুকের মধ্যেই শুনেছি
কেবলই মনে হয়েছে অন্ধকার বুঝি বাজবে বর্ষার মতো
আর আমি সেখানে আমার শুকনো ঠোঁট পাতব,
মনে হয়েছে আমার রক্তের কোরক থেকে
আশ্চর্য ফুল ফুটবে,
ভেবেছি উদ্দাম আলোয় রাত্রিকে জুড়ব
সব প্রখরতা যে-চূড়ায় উঠে ভেঙে জুড়িয়ে যায়
সেখানে পৌঁছব,
চেয়েছি
রোদের প্রণয়ে যেন সব তারা ফুটে ওঠে
যেন সব কিছু চেনা যায় আমার প্রগাঢ় চোখে ;
কিন্তু দিন অথবা রাত থেকে বেরিয়ে এসে
যত মুখ আমি দেখেছি তারা জলন্ত
আমার চোখের জালায় তারা গড়া।

জীবনের মহড়ায় আমার পদক্ষেপ
একই অন্ধকারে,
কোনো সেতুর দিকে তা এগোয় না,
আমার সামনে
সমস্ত মেয়েপুরুষের মেলায় মিলবার পথ
প্রত্যেক প্রত্যূষে আর গোধূলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

মধ্য দিনে
টগর চুঁইয়ে চুঁইয়ে রোদ ঝরছে
টকটকে রোদ জবার ঝুমকোয়
আমি ছায়া খুঁজছি

তোমার গলার স্বরে,
আমার ঘুমের স্তরে স্তরে বিছোনো
তোমার কথা
কথা থমকে গেলে আচ্ছন্ন
কান্নায় ভাঙো
তখন আমার মধ্যে তুমি ছড়িয়ে যাও
দুলতে থাকো
জলের নিচে যেমন আবছা উদ্ভিদেরা দোলে
আর তোমার হাসি থেকে উদ্গত রাত্রি
যেন এক ঝর্না
আমি শ্যাওলা-ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের মতো আবিষ্ট,
তোমার স্বরে আমার শান্তির আস্বাদ।

দুঃখ আর আনন্দের ঝঙ্কার
দাবদাহ জুড়িয়ে,
পাখির নীড়ে ফেরার শব্দ
আশ্রয় শান্তি বেদনার দোলা
দিনের একান্তে ছায়া আরো ছায়া
আমার স্নায়ু ছেয়ে তোমার স্বর।

তোমার গলার অন্ধকারে
রহস্যের পর রহস্যের সৃষ্টি।

এর পর
বাগানে ফুলের আভায় চমৎকৃত মুখ
আর কথার ঝুমুর,
অনর্গল শরীরের ঢেউ
পরিষ্কার হাওয়ায় পল-কাটা,
মনের বাঁকা পথ আলোয় তোড়ে ভেসে গিয়েছে
আলোয় ভাসছে মেয়েরা

তাদের গালে গলায় জ্বলে উঠতে স্বচ্ছ দিন
তাদের ঘিরে নাচ
যেন পেখম মেলেছে আলো,
পাপড়ি আর পাতায় ঝাড়
চোখের পদ্মপলাশ
চিকন বাহার কোণে কোণে ঠিকরোয়।

মাটির ভিতর থেকে ছিঁড়ে-যাওয়া দিন
সব ভাবনার বাইরে আলগোছে ধরা।

এর পর বাঁচবার সময়।

দিনের এই ভঙ্গুর পাত্রটা এখনি খানখান হবে
আর সে-ঝঙ্কনা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছড়াবে
বিস্মরণের সীমা পার হয়ে ছড়াবে
একেবারে হৃদয়ের তল পর্যন্ত
তারই রেশ ধ'রে বুড়ি পৃথিবী কতকালের গান ধরবে
ধুলোয় ধুলোয় শিকড়ে।

আবার আমাদের ঘর
আবার আমাদের রক্তে মাটির কল্লোল।

ঝড়ের কেন্দ্রে

আমরা ঝড়ের কেন্দ্রে বসলাম
এখানে সুস্থির হওয়া যায়
সামনের সীমানা পার হয়ে
আলোড়নের পথগুলো ছড়িয়ে যেতে থাকুক
এখানে চলুক আমাদের গল্প।
ওই ঘরছাড়া ছেলেটার মুগ্ধ চোখ ঢাখো
মনে হয় যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কল্পনার রাজ্যে পৌঁছে গেছে

অন্ধকারে মাথা রেখে এমন উজ্জ্বলতা পেয়েছে ও।

আমরা বলি এক শান্ত আকাশের কাহিনী
যেখানে আমাদের ঘরকন্নার পৃথিবী
স্থির দীপ্তি দেয়,
আমরা তুফানের পরের কাহিনী বলি
যখন গাছপালা ক্ষেত প্রলয়ের জলে ধোয়া
নতুন মাটি দিয়ে সমস্ত ইচ্ছার মূর্তি তৈরি হয়
বীজ ফেটে ফেটে শস্য জন্মানোর সঙ্গে
নানান্ রঙের দিনগুলো জন্মায়।

ঘরছাড়া ছেলেটার চোখে তন্ময়তা ত্যাখো
যেন যার দিকে শেষবার তাকিয়ে আবিষ্ট হয়ে আছে
যেন এই কাহিনীতে ওর ফেরবার ঘর গ'ড়ে তোলা হল
ওর সেই মাটির পিদ্দিম থেকে রোশনাই জ্বালিয়ে রাখা হল।

আমরা একসঙ্গে বসেছি
আচ্ছন্ন পৃথিবীর শিয়রে হাত রেখে ডাকছি
রূপকথার স্বরে,
তাকে ঝড়ের পাখায় উড়িয়ে নিয়ে যাব বলছি।

দরজা জানালা খুলে দিয়েছি

দরজা জানলা খুলে দিয়েছি
কান পেতে থাকো,
জোয়ারের বুক থেকে বাতাস হয়তো
এক দমকায় উঠে আসবে,
নিঃঝুম ঘরের গহনে তখন
তুমি যেন নিমেষে উৎসারিত হতে পারো।

আমাদের জানলার ধারে
মরা ডালটা শূন্যে বাড়ানো

আমরা এতবার তাকে দেখি,
সেই কবে আমরা অঝোর বৃষ্টি শুনেছিলুম
তার পাতায় অন্ধকার গানে মেতেছিলুম,
আজ সে আমাদের সীমান্তে এক নিশানা হয়ে গেছে,
হিমের করাত তাকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাটেনি,
এইবার হয়তো সে নতুন ক'রে ঝলকাবে,
চুপচাপ তার ওপর
আমাদের ভালোবাসার কথাগুলো মেলে রাখো।

দিনের মাঠে ছুটে ছুটে তুমি হয়রান
একটা পালক ছাড়া আর কিছু পেলে না
আমার হাতে তা রেখে তুমি মুখ ঢাকলে,
দ্যাখো তোমার সে-পালক আমি ফেলে দিইনি
সন্ধ্যার মুকুটে প'রিয়েছি,
অস্ত রোদ ঝিমিয়ে গেলে
পলাতক সব ডানার মোড় ঘুরবে
হয়তো আমাদেরই দিকে।

এখানে কিছুই ফুরোয় না।

এখন খোলা আকাশ

চাঁদোয়ার লতাফুল গ'লে গিয়েছে
এখন খোলা আকাশ,
চাঁদ তারা সূর্য মেঘ ধ্বনির একই নীলে ভাসে,
এই নতুন শূন্যে আমি তাদের কাছাকাছি
বিলম্বিত লয়ে আমার স্বপ্ন অন্ত সংসারে,
মহাজগতের কোনো ঘর
অসীম প্রান্তরের মর্মরে উদ্ভাসিত,
আমি দিনরাতের সীমানা পার হয়ে চলি।

কিন্তু বৃষ্টি নামে।
হালকা সাদা মেঘ এমন ঘনঘোর হবে কে জানত?
আষাঢ় শ্রাবণ কলস্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমার চোখে মুখে চেতনায়,
ঘুমন্ত উপকূল ভাসিয়ে সমুদ্রও এসে যায়
আর বাতাসে ভরে পঞ্চমুখী শাঁখ ;
গুরুগুরু মেঘ সমুদ্র হৃৎপিণ্ড
ধমনীর বিদ্যুৎ গমক
উতরোল নির্জনতা।

বৃষ্টি থামে।
ঘাসের ডগায় কচুপাতায় টলটলে ফোঁটা,
সুস্থির নিঃশ্বাসে তাদের ধ'রে রাখতে হয় ;
আলোর দিকে অন্ধকারের দিকে মীড়
আমাদের চিরকালের আপন বসুন্ধরা
ললিত রঙের ছটা পুবে
পটদীপে সাজানো সন্ধ্যা
গম্ভীর রাত্রির যোগে আবিষ্ট প্রাণ।

কখন আমি চোখ বন্ধ করেছি জানি না,
উত্তরঙ্গ পথের উপর শান্তির আভা ফুটছে দেখি।
পাশ থেকে কে একজন জিগ্যেস করে কটা বাজল ;
কী ক'রে বলব ?
আমি তো সময়ের আরম্ভে রয়েছি।

কোলাহল

মুহুর্মুহু ঝাপটায় কোনো কথা আর শোনা যায় না
সুতরাং আমার আগ্রহ মনের মধ্যেই জীয়োনো রইল।

কে একজন উপরে তাকিয়ে ছিল
তারাদের চিনে চিনে নাম বলছিল

প্রচণ্ড দিনের পর যে-সব তারা ওঠে
পৃথিবীর ছবি টাঙিয়ে রাখে
পৃথিবীর গন্ধে রাত ভুবিয়ে দেয়।

আর একজন আঙুল বাড়িয়ে ছিল
মানুষের দিকে
বন্ধুদের চিনিয়ে চিনিয়ে
প্রেমিক আর বীরকে চিনিয়ে চিনিয়ে
কিছু বলতে চাইছিল।

কিন্তু তাদের কথা আর কানে এল না
কোলাহলের ঢেউয়ে ডুবে গেল

আমি ফিরলাম
কখন নিঃশ্বাস শুনতে পাবার মতো রাত্রি আসবে
তার জন্যে অপেক্ষা করছি
সেই প্রশান্তির দিকে ফিরে আছি।

শেষ ঘণ্টার পর

শেষ ঘণ্টার পর প্রকাণ্ড মুহূর্ত ;
দীর্ঘ দেবদারুর মরীচিকা ফোটে,
গোটা দলটা সন্ধ্যার দিকে এগোয়
মুগ্ধ শান্ত সরোবর যেখানে।

চলতে চলতে স্পষ্ট আর কিছু দেখা যায় না
আশপাশের কাউকেও আর দেখা যায় না,
সামনে পাথরের অতর্কিত প্রতিবিম্ব
সৌধ মূর্তি স্মৃতি,
মনে হয় কোনো জয়ঘোষণার অনেক চিহ্ন—
কার জয়?

এক একজন ক'রে চৌচির ময়দানের উপর চিৎ হয়ে শোয়,
কোন্ দিব্য মুখ জ্যোতি ছড়াবে
তার জন্যে আকাশ তন্নতন্ন করে।

একটি সকাল

রাস্তা যেন পাতায় ইশারায় তোলে
ডাইনে বাঁয়ে ময়দানের টানে গা ভাসায়
ভোর থেকে হাওয়ার মহলে
কেবলই সমুদ্রের ডাকাডাকি
করুণ শুকতারা ছাপিয়ে কেবলই বালির মর্মর।

আমিউদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাই
সকাল বুঝি এইবার প্রবালের লাল ফুল ফোটাবে
আর আমি বেড়া ডিঙিয়ে
পূর্ণিমার জোয়ার পর্যন্ত হেঁটে যাব।

এই বিস্তীর্ণ উচ্ছ্বাসে আমি ভিড়ে যাই
যেন এক গানের নিটোলে
যুক্ত হই।

চেনা সাঁকোটা কিন্তু ভীষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে দোলে
তার বেতাল পাছে সর্বনাশ ঘটায় তাই
ওধার থেকে আমি স'রে এসেছি।

প্রবাসে

গাছে গাছে গুমোট
যেন কালবোশেখীর প্রতীক্ষা,
আমি ওদের গায়ে হাত দিলেই কি বৃষ্টি নামবে
বাংলার বৃষ্টি ?

শক্ত খাট
তার উপর ঠাণ্ডা মাটির প্রলেপ দেয়
আমার চোখ,
মেয়েদের শরীরের তীব্র ভঙ্গি
এক নিমেষে সজল হয়ে ওঠে,
তালবনের দীঘিতে তারা স্নান সেরে এল মনে করি।

•

যত বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে তন্দ্রা নামে,
অস্ফুট শুনতে পাই মাঝির একটানা চিৎকার :
বাঁও মিলে না—
সুন্দরবনের ভোর বুঝি হল
দুরন্ত তট আরো উজিয়ে
স্নেহ আর সংগ্রামের দুই তট বাংলায়।

আমার বিছানাটা নৌকোর মতো দোলে।

•

আমি গলার আওয়াজ ছুঁতে পারি
আমি চোখের দৃষ্টি ছুঁতে পারি
যখন লোকে তোমার নাম বলে
তোমাকে দেখে আসে।

জনমদুখিনীর ঘর
দুয়ার কয়েকটা ছোপ
ধানের গুচ্ছের একটু ছটা
কয়েকটা দোয়েল ফিঙে টুনটুনি
নরম হাসির আভা
দু-একজনের ঠোঁট আদর করার মতো খোলা
এই সব নিশানা ধ'রেই
এখানে ফিরেছি আমি।

দুরন্ত রোদের টিলা পেরিয়ে এলাম,
কুয়াশা প্রান্তর বনবাদাড়ের রাত
আমায় ধোয়ায়নি আর,
অচেনা হাটুরে আনাগোনা ক্রমে ক্রমে মুছে গেছে,
নানান্ জিজ্ঞাসাবাদ বিচিত্র ভাষায় স্তূপ ঠেলে
এখন আমার কান শুধু এক ধ্বনিতে পেতেছি।

সেই পিদিমের আলো দেখা যায়.
জনমদুখিনীর ঘর।
কবে আমি বড় হয়ে তাকে ছেড়ে চ'লে আসি
তবু তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে,
ঘুমের সময় যত গল্প ছিল আমাদের
অন্ধকার ভরাত যা সবই সে তো রূপকথার
তবু দুঃখ ঘোচানোর গোপনতা নিয়ে
গল্পের রাতের মধ্যে অভিভূত আমরা ঘুমোতাম।

তারপর একদিন বেরিয়েছি,
সন্ধ্যার সীমান্তজোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে
কতদূর চ'লে গেছি,
কিছুই মনের মধ্যে পথ খুঁজে কতবার দিশেহারা,
রূপকথার কোনো দেশ দেখিনি তো।
আজ দুব্বা ধান পাখি দেখে
ভালোবাসার দু-একটা মুখ দেখে
এখানে ফিরেছি।

পিদিম জ্বলার একলা ঘর,
ওই আলো অন্ধকার আমার নাড়িতে বাজে,
আমার শ্রবণ একক স্বরের স্থিতি পায়:
ভাঙাচোরা বুড়ি গলা
বিশুদ্ধ অন্তস্পর্শ,

ঘরে ফিরতে ব'লে ডাকে।
সন্ধ্যেটা নেবার পরও এই ডাক ঘুরতে থাকবে
যতক্ষণ না আমি
রাস্তিরের গন্ধগুলো মনে চেপে
আবার দাঁড়াব গিয়ে দুঃখের দুয়োরে।

কতকাল ধ'রে
সামনে যে দু-জনের ছায়া নড়ে
তারা কি বিদায় নেয়,
না অনেক দূর থেকে অবশেষে কাছে এল ?
পথে ঘাটে যে-আলাপ থামে ফের শুরু হয় থামে
তা কী বলে ?
কথাগুলো কোনো কোনো ভঙ্গি নিয়ে
গম্ভীর দুঃখের মতো
অথবা হাসির প্রান্ত ছোঁয়া।
ধুলো-ওড়া বেলা থেকে রাত দু-পহর
এক হয় দীর্ঘ হয় এক ছায়া,
চেনা কারবারের পাড়া জাগে রোজ
বাতিগুলো একে একে আবার নেবায়।

কতকাল ধ'রে এই দেখা।

দূর বছরের কোণে একটি বালক
থর প্রত্যাশায় কাঁপে
একাগ্র তাকিয়ে থাকে
গাঢ় রং ছবি যদি ফোটে
নিকটের জনতায় পটে,
শুজন সরিয়ে কান পাতে
জোয়ারের দিকে,
সুপুরি গাছের ঘন সারি

কত ঢেউ নেড়ে নেড়ে
কল্লোলে ভরিয়ে তোলে হৃদয়টা
বঙ্গোপসাগর যেন ওই মোড়ে এসে যায়
রক্তে তার যত কথা-কওয়া
ঘাস ফুল রোদ তারা
ধ্বনি যেন ছোট্ট এক জীবনের তটে লেগে,
অনেক বাতাসে বুক ছাওয়া।

এখনো মাটির ঘর ডানামোড়া
ধুলো-ওড়া বেলা থেকে রাত দু-পহর।

প্রখর দৃশ্যের মধ্যে
এইখানে শিয়র রাখো
বলে সন্ধ্যা-অভিভূত প্রাণ,
এতক্ষণ যত তোলপাড়
ডানা মোড়ে এই বাসায়
যত খর টান
নিথর শান্তিতে থামে,
রুদ্র সাগর শুধু পাঠায় এখানে
মগ্নতার স্বাদ,
সব চিৎকার যেন হঠাৎ অগাধ মৌন।

এ এক মূর্ছার বেলা,
তার সীমান্তে যদিও
প্রসন্ন রঙের সুর
তবু তার পারেই কি মৃত্যু নেই?
নিঃসাড় মৃত্যুকে তবে ঠেকাব কী ক'রে?
আমার দৃষ্টির ভিতরে
যে-পৃথিবী বেঁচে থাকে
সেই তো আমায়

জীবনের রক্তাক্ত চূড়ায় রাখে,
তাকে মুছে দিলে
আমার কঙ্কাল এক
প্রাগৈতিহাসিক পাথর
আমার প্রেমের আর গর্বের মন্তর
তখনই ফুরোবে।

আমার ধমনী লাল স্রোতে
টানটান
গভীর ক্ষতের উৎস থেকে,
আমার নিঃশ্বাস সবই
আমার বুকের হাওয়া,
সর্বদা অস্থির পাওয়া
সমস্ত প্রিয়কে একই মনের মিছিলে।

এখন মৃতের মধ্যে র'য়ে যাই :
রোদ্দুরের ইস্পাত জলে মাঠ থেকে মাঠে
কণ্ঠের গরলে
কথা নীল
এলোচুল বিদ্যুৎ আঙুলে ছোঁয়া
শীত আর গ্রীষ্মের ঝলকে
অসংখ্য শরীরে রোদ ফুটি
দিগন্ত পাখার ওঠানামা
সেই তীক্ষ্ণ হাওয়ায় উজ্জ্বল আমি।

মনে পড়ে
কঠিন হাতের ছটা মিলিয়েছে,
সেই সব হাত যারা শিকড়ে শিকড়ে
উত্তাপ জাগিয়েছিল সেই দীপ্তি,
কোথায় রেখেছে তাকে কালো মাটি?

আকাশ ছাপিয়ে
জল আর জল পড়ে,
আলোয় সে মাঠঘাট বুঝে, আছে, পাতাগুলো
অন্ধ এক বুড়োর মতন নড়ে।

ঘর থেকে ঘরে যাওয়া-আসা
দূর দূর আঙিনায় স'রে গেছে,
এখন কি পড়বে মনে তারা
প্রান্তরের ঢেউ লেগে দুলেছিল আশায় আশায়
ঘনিষ্ঠ কথার ছন্দে ?

এলোমেলো সব মুখে নিঃসঙ্গতা ছোঁয়া যায়
সন্ধ্যার আগুন নিবে যায় এক কোণে।
নির্জন স্মৃতির রাজ্য সেখানেই খোয়াকেরা
একটি হাসির রেশ সেইখানে কাঁপে
প্রথম অঙ্কুর-দেখা আলো নিয়ে,
সে-হাসি ছিটিয়ে থাকে এই
হাওয়ার তিমিরে জলে অবিশ্রান্ত মেঘে।

পাথরের দিন ভেঙে

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে পেলাম আমি
নীল বন
তার ছায়া ঘরের সামনেই টানি,
আমার ইচ্ছার আকাশ
এই সমতল ঘিরে আছে,
তোমাকে একান্ত ক'রে গড়ি তাই
বালিতাপ চূর্ণ ক'রে মুহূর্তেই
অনেক নক্ষত্র দিয়ে উদ্ভাসিত করি
আবার একটি দিন
যেখানে রাত্রির মনে তুমি থাকো।

আমার শপথগুলো স্তবকের মতো
ধরি দূর চোখে
যে-চোখ অনন্ত থাকি
শিশিরের উৎস ক'রে,
শহরের ধুলো
গহন মাটির কথা ব'লে চলে
যেন কোনো বীজ থেকে অপরূপ রহস্য জন্মাবে।

রোদ্দুরের ঝোঁকে
যত ধস নেমে আসে সেই অগ্নিপথ
অরণ্য-আভায় ঢেকে দিই,
তোমার সহজ বিকিরণ
খুঁজি এক গভীর স্বভাবে,
পাথরের জিন ভেঙে তোমাকেই আবিষ্কার করি

মঞ্চের বাইরে মাটিতে

নিভৃত

সূর্য-আঁকা দরজাটা হেলে পড়ে,
আমি নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হই।
তুলসীতলায় পিদিম সমুদ্রের হাওয়ায় নিবে আছে
রূপকথা জড়িয়ে লাউমাচার আঁধার
কল্লোলের কোন গহীনে নেমে গেছে।

এক কণ্ঠস্বরের আলো
এই উঠোন থেকে সরু পথ ধ'রে
আমাকে বহুদূরের বিস্তারে নিয়ে গিয়েছিল।
তখন সন্ধের দোকানবাজার মিটেছে
লোকজন সওদা নামিয়ে স'রে গেছে,
নানান বেসাতি এখানে ওখানে ছায়া হয়ে প'ড়ে রইল
আমি চললাম মোহনায়।
অবশেষে পথ ফুরোল আর আমি বিপুল জলের ধ্বনির ভিতরে চোখ
বুজলাম।

এই আমার চেনা জায়গা চেনা সময়,
শান্তির আদিগন্ত রাত নিয়ে আকাশ,
আমার মার আঁচলে কত তারা কত তারা।

এবং সবাই শুনল
আমি যেতে না যেতেই ইচ্ছামতী অন্যদিকে ঘুরেছিল।

যত সূর্য তারই বুকে
প্রত্যেক আকাশের সব নক্ষত্রই তার বুকে
তিমিরের মুহূর্ত থেকে আমি তার কাছাকাছি,
যখন বিদ্যুৎ;চমকেছে বৃষ্টি পড়েছে তখন

যখন আগুন ধরেছে তখনও।
তার সঙ্গে সংলগ্ন হবার জন্যে আমি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম,
সামনের অশথপাতারা ঝিলমিল করলে
কিম্বা পাতার আড়ালে হলদে পাখি ডাকলে
আমি সেই দিনটার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি
অথবা ইটকাঠে যখন টান ধরেছে
বা রং বদলে তারা উদাসী হয়েছে
আমি তাদের হৃদয়কে আঁকড়েছি।
সেই একটাই পথ ছিল।
অথচ আমি একেবারে কাছে যেতেই ইচ্ছামতী ঘুরে গেল।

তারপর আমি ধুলোর উপর বসলাম
এবং, আশ্চর্য, সবাই শুনল
আমার মুঠোয় আলোর ঝুমঝুমি বাজছে,
বালক বন্ধুরা এসে ঘিরে ধরল
জানতে চাইল রহস্যটা কী।
আমি কিছুই বলিনি
কেননা আমি তো শুধু এই বলতে পারতাম :
পুরোনো ভাঙা ঘরটা আর ঐ উঠোনটা ছাখো
এবং যে ইঁটপাথরগুলো ফেটে গিয়েছে তাদের শোনো।

সেই ছোট্ট জনতার পেছনে আমার মাকে এক সময় দেখেছি,
আমি কিছুই বলিনি
কিন্তু একমাত্র আমার মা সব বুঝেছিল যেন।

প্রাজ্ঞের মতো নয়

প্রাজ্ঞের মতো নয়, অজ্ঞের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রে বলো। আমার রাত্রিজাগা অসমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ ক'রে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার স্তব্ধমুখের অন্ধকারে

রাখো তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাব। মনে নয়, তার বাইরে মাটিতে বৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে আছি।

দু-একটা ঘাসের ডগা কখনো-সখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি ভাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য কাটলে আমাদের শিরাউপশিরা বিভক্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।

বৃষ্টির দেশ থেকে এলে

তুমি বৃষ্টির দেশ থেকে এলে। এই এতগুলো পাতা আমি জড়ো করেছি, এত ডালপালা। ভাখো তো এরা তোমাকে আগুন ছাড়া অন্য কথা বলে কিনা।

●

যে ছেলেটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘরে ফিরবার নাম নেই। কী নিয়েই বা ফিরবে? আমি তাকে এমনিভাবেই রোজ দেখি। আমার বিশ্বাস সে সব সময় অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু তার কপালের রক্তচিহ্নটা এক-একবার আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে। তুমি হয়তো বুঝবে, মানুষের লক্ষণগুলো তুমি হয়তো ঠিক ঠিক জেনে এসেছো।

●

পাঁচ ক্রোশ পথ ভেঙে আমি গিয়েছি ইস্পাতের নদী দেখতে। কোনোই মানে ছিল না। সে জ্বালাপোড়া তো এখানকার বাতাস ছেয়ে আছে। তবে এইটুকু আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে। তুমি মৌসুমকে জানো, ফসলকে জানো, এই মাটিকে একবার তুমি আদর ক'রে ভাখো।

●

মুগ্ধতার একটা চেহারা বোধ হয় কোনো এক মুহূর্তে আমার নজরে এসেছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তোমার জলছোঁয়া হাত কি তাকে নতুন ক'রে গ'ড়ে দিতে পারবে?

গোল পার হওয়ার সময়

গোলপার হওয়ার সময় আমার এক ধরনের ভাবনা হয়। পায়ের নিচে খিলেনটা ভেঙে পড়বে, তা নয়। বা লোহার মুঠোয় আমার নিঃশ্বাস আটকে যাবে, তা নয়। আমার ভাবনা হয় আমি কীভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব। যে-কয়টা স্থির বিন্দু ছিল ছাড়িয়ে এসেছি। এখন নতুন চিহ্ন তৈরি করতে হবে যা দেখলে নিজের বুকের ধুকধুক প্রিয় শোনাবে। যা দেখলে টের পাব টকটকে ইস্পাতের মুখে হাত রেখেও আমি শীতলতায় আছি।

আর, খুব পুরোনো কথা মনে আসে। যেমন, নগরীতে প্রথম পা ফেলা। তীব্র রোদের মধ্যে শুনলাম "তোমার মুখ পদ্মের মতো ফুটেছে।" পদ্ম পদ্ম পদ্ম। এই একটা শব্দ কেবলই আমাকে ধ্বনিত করেছে। যখন মনে হল আমি আরেক আগুনে, তারপরও। এবার যদি সমস্ত মাটি সীসের মতো হয় তবুও কি বিকশিত হওয়ার কথা শুনব ?

নির্ভর

মনে হতে পারত আমার হাঁটা নিশি-পাওয়া,
মাথার উপরে চাঁদ : আমি গভীরভাবে আহত।

বাগানের পর বাগান তাদের অনবদ্য ছায়ার হাত
আমার শরীরে রেখেছিল,
বাতাস এক বিশ্রামের কপাট খুলে দিয়েছিল,
আমি দেখেছিলাম
সময়ের ঘন্টা জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ নিশ্চল প'ড়ে আছে।
একটু ঘন ক'রে নিঃশ্বাস নিলে
অভূতপূর্ব স্বস্তিতে আমি ঢ'লে পড়তাম,
যে-সব ডানা আমার দেখা নেই
তারা আমাকে নিয়ে যেত
চন্দনের বনে, শিশিরে।

কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না
কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না,
কারণ আমার বিশ্বাস গুস্ত ছিল পাথরে
এক অনমনীয় পাথরে।

উন্মুখ

প্রহরে প্রহরে আওয়াজ
তারা একের পর এক সূত্রে গাঁথা হয়,
সময়ের গম্বুজের নিচে আমি দাঁড়িয়ে।

পাথরগুলো খুঁটিয়ে দেখি
যদি কোনো ঝর্নার ছোপ কোথাও লেগে থাকে,
তাদের উপর বার বার কান রাখি
যদি তারা গুঞ্জন করে।
মিলিত স্বরের জন্যে এক গান বাঁধা ছিল
কিন্তু কারা তা গাইবে?
নতুন বছরের সুরে
সন্ধ্যা আর সকালকে যারা উজিয়ে নিত
তারা কই?
চারদিকে স্থবির ঘর অন্ধ জানলা,
নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না।

সকলের উদ্দেশে নাচ হবে
তার জন্যে ধুলোর আস্তরণ পাতা ছিল,
গাছের ঝুমুর বেজে উঠলে
সারা শহরটা পায়ে পায়ে দুলত।
এখন পাতার নির্জনে স্তব্ধ ছায়া,
সাজানো রাস্তাঘাট কাঁচের মতো ভঙ্গুর।

•

তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছো
তোমার দিকে আমি চোখ ফেরাই
আমার একমাত্র সাথী
তোমার ভাষার গন্ধে আমি উন্মুখ,
তুমি আমাকে কোনো স্রোতের কথা বলো

একটি শিখাও আর

একটি শিখাও আর প্রতিবিম্ব ফেলে না
তারা অঘ্রানের বিকেলে নিভে গেছে,
শরীর আর বৃক্ষ আর পাথরের আগুন
পৃথিবীর জঠরে ফিরেছে,
পশ্চিমের দীঘিতে হাওয়া ঝরে
শীতল বৃন্ত পাথরে বৃক্ষে শরীরে।
কিছুই আলোকিত নয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা
অন্ধের শাখায় কঠিন অন্ধকারের
অপরিচয় থেকে আপন হওয়ার মতো ;
শিকড় যতদূর থেকে রস টানে
ততদূর রক্তের রাত্রি ছড়ানো,
জাগরণ আর অন্বেষণের
তবু দুই চোখ বিস্ময়ের আকাশ।

পশ্চিমের দীঘিতে ঝরা পাতা
বিস্মৃতির হাওয়ায় মৃত,
সময়ের এইখানে অবগাহনের কেন্দ্র
গাঢ় থেকে গাঢ়তর নিমজ্জন।
কিন্তু একটি অনির্বচনীয় ধ্বনির জন্যে
হেমন্তের দৃপ্ত নিস্তব্ধ—
আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি, অন্তিম প্রহর।

উচ্চকিত মাঠ ছাড়াতেই

উচ্চকিত মাঠ ছাড়াতেই
আমরা এত কাছে,
প্রতিধ্বনির চক্র থেকে বেরিয়ে আসার পর
আমাদের ধমনী শুনছি,
আমরা স্পর্শের নির্জনে নেমেছি,
কাঁচামাটি আর ঝাউদেবদারুর সন্ধ্যায়
আমরা প্রবেশ করেছি,
ছায়ায় আমাদের মুঠো খুলেছি,
এবার একবার গাঢ় পুকুরে
আমাদের হাতপামুখ ধুয়ে নেব।

বিস্তর কথা জমায়েতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল,
তাদের অর্থ পরিষ্কার ছিল না
কিন্তু তারা ঝড়ের বেগে
আমাদের উদ্দাম নাড়িয়েছিল,
কুচিকুচি রোদের ঘূর্ণিতে
আমরা ঘুরছিলাম ;
তখন এক মুহূর্তও ভাবিনি
এই প্রতিশ্রুত সময়ে আমরা ফিরে আসব।

বাতাসে আমাদের মুখ তুলেছি,
মনে হয় বৃষ্টি হবে।
আমরা বৃষ্টি আর শীকরের কাছাকাছি,
আর একটু হাঁটলেই গাঙ,
সেখানে আমাদের জন্যে একলা
তন্দ্রাহীন নৌকো দুলছে।

শেষ নক্ষত্রের বিদায়ের পর
পাথরে আর ঘাসে পা পড়ে,
কুয়াশার সীমান্তে যারা জেগে উঠেছে
তারা হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল,
এক বন্ধ মুহূর্ত তাদের চোখে অবয়বে।

শেষ নক্ষত্রের বিদায়ের পর
আমি এই উদ্ভাসিত প্রান্তে দাঁড়িয়েছি,
অনেক নিঃশ্বাস অনেক কথায় চমকে
পাপড়ি আর পাতাগুলি জলজল করে,
পথের ছটা সমস্ত দুরন্ত ছাপ মুছে ফেলেছে।

এখানে ইচ্ছামতীর মুখ আর ভাসে না,
আমি তাকে খুঁজতে গিয়ে কেবল খেই হারাই।
আমার মুঠোয় ধরা রয়েছে একটা নুড়ি

গহন প্রবাহে নেমে আমি তাকে পেয়েছিলাম,
কিন্তু তার গায়ে সে-তিমিরের আভা নেই।

পৃথিবীর সব রেণুর কথোপকথন সমাপ্ত হয়েছে,
স্পষ্ট রেখায় এই জনপদ আমার সামনে।

যাত্রার বেলা
উজ্জ্বলতার মধ্যে যাত্রা।

ধোঁয়াবাঁধা লণ্ঠনটা সীমানার ওধারে মুখ থুবড়ে রইল,
কোনো সময় তা এক নিশ্চিত চিহ্ন হবে কিনা কে জানে।
দিনের জোয়ারে তলিয়ে যাবার আগে
নির্জন প্রতিকৃতিগুলি শেষবারের মতো ভেসে ওঠে।

জানলাগুলোর ফিসফাস বন্ধ হয়ে গেল,
পতঙ্গেরা সকালের এক-একটা দীপ্ত কথা নিয়ে ঘোরে,
ধুলোর আর বাতাসে আমাদের জলবায় সঙ্কেত।

আমরা মাঠের শুকনো দাগ বরাবর এগিয়ে যাব
আমরা শহরের একটানা তেজের ভিতর দিয়ে চলব,
নিভৃত আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধ'রে
তৃষ্ণার শিখরে আমাদের উঠতে হবে।

এখন রোদ্দুরের ভূমিকা।
একজন বলে : এই তো ফসল পাকবার রোদ্দুর।
এই কথাটুকু আমরা মনে মনে আঁকড়ে ধরি
যেন আমাদের সমস্ত সান্ত্বনা তাতে রয়েছে।

উজ্জ্বলতার মধ্যে যাত্রা,
আমাদের প্রতিবিম্ব অগ্নিকোণে।

মধ্যদিন

আলোর সেতুর উপরে আমরা।

দুরবগাহ ধারা কোন্ অন্ধকারে বয় ?
সে বুঝি পাতালসমান নিচে;
আমরা তাকে দেখতে পাই না, তার কথাও বলি না
কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হলে দুর্বোধ্য ধ্বনি শোনা যায়,
আকাশকে এক মুহূর্ত ভুললে রক্তে ঘোর লাগে।

আমি পিছিয়ে পড়তে ওরা আমাকে ডাকল
আবার আমি ভিড়ে মিশলাম।
একটা নিরালা কথা মুখ থেকে খসল
আর অমনি আগুনের ফুল হয়ে ফুটল,
বাসনার সব আঘ্রাণ তা থেকে রোদ্দুরে ধোয়া

মুদ্রিত চোখে যে-সূর্যকে দেখেছিলাম
অন্ধকারের কোরক তাকে বুকে রেখেছে,
সে এখানে নয়।

এখান থেকে যতদূর দৃষ্টি যায়
দিনের দুর্দান্ত রাজত্ব।
আমরা যেন কোনো প্রজ্জ্বলন্ত মহিমার উৎসর্গের বেদীতে
নিজেদের নিয়ে চলেছি।

তবু মনে করি জলে ছায়া কাঁপবে
যদি এই রোদের সেতু পার হই।

রাত্তিরের হাট এইবার ভাঙবে

রাত্তিরের হাট এইবার ভাঙবে;
ছোট ছোট বাতির সামনে ছায়ার নিবিষ্টতা,
ফলমূলের পসরার উপর হাতগুলো স্তিমিত হয়,
কথার মাঝখানে কুয়াশা নামে,
গুটিকয়েক ভঙ্গি তীব্র হতে গিয়ে প্রতিবিম্বে ছড়িয়ে যায়।

এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ডাক আসে,
কারো নাম বলে না, কোনো সন্ধান করে না,
কেবল এক দূরত্বের স্বরে শূন্য ধ্বনিত হয়,
আরো অন্ধকারে যাবার জন্যে ব্যগ্রতার এক ভাষা।

নোঙর তুলে ভেসে পড়ো,
চলো সেই শহরের কিনার ঘুরে রেখে
যেখানে নিষ্ঠুর পাষাণ জলছিল,
সেই মস্ত ক্ষেতের উপর দিয়ে
যেখানে গ্রীষ্মের রাজ্যপাট বিছোনো ছিল,
বালিয়াড়ির দিগন্ত পেরিয়ে চলো,

তারপর হিমের আকাশ জুড়ে
অন্ধ দেশের রাত।

সমস্ত মুখ ছায়ায় ভুয়ে পড়ে,
কেউ আর অন্ধকারকে ঠেকায় না।
হাটের সারা জায়গাটা বাতাস লেগে টলমল করে।

দূর দুরান্তের পর

দূর দূরান্তের পর
প্রগাঢ় তমিস্র সম্ভাষণের পর
আবার কাঁকরের মুখ।
এই দরোজা দেয়াল জানালা
বিরল মমতার আস্তরণ খসিয়ে ফেলে
এক বিন্দু ইতে ধুধু করে।
শার্শিটার গায়ে একটু নিঃশ্বাস লেগে আছে
মনে হয় আমারই নিঃশ্বাস,
আমার রক্ত যেন কথা বলতে চেয়েছিল
কিন্তু জিজ্ঞাসায় নয়,
ফসল যেমন ফলে তেমনি ক'রে বলবার জন্তে।

আমার প্রাচীন হৃৎপিণ্ড
কোনো প্রস্রবনে আর উৎসুক হয়ে নেই।
জল টের পাবার স্পর্শ নিয়ে এক দুর্বোধ্য ঋতু
নিরুদ্দেশে গেল,
আমি এই হাত অন্ধের মতো মেলে
তাকে নিঃশব্দে বিদায় দিলাম।

ঐ তো চৌমাথায় দশদিক খোলা
যদিও বারান্দার এত কাছে তবু তা আগে স্পষ্ট দেখিনি,
সবুজ লাল কোনো সঙ্কেত সেখানে নেই,

সে এক কেন্দ্র যেখানে সব প্রৌঢ় হাওয়া জড়ো-করা,
আর আমি ঘূর্ণির এত কাছে।
আমার অন্ধকারের দশটা ছুঁচ
আমি এই নতুন আগুনে ফেলে দিয়েছি,
একেবারে গোরগোড়ায় শখের বাগানে
একটি গোলাপে কেবল অধৈর্য রং থাকুক।

আর দেরি কেন,
দাও আমায় কপালে যন্ত্রণার রাজটীকা দাও,
আমার জন্যে এই সময়ই তো নির্ধারিত হয়েছে।

কয়েকটা বাড়ি

কয়েকটা বাড়ি শুধু অন্ধকারেই আমি চিনতাম। আমার বিশ্রামের ঘাঁটি। সূর্যের পথে সেখানে পৌঁছে আবার অবিরল ধ্বনির জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েছি। এখন তাদের আমি আর চিনতে পারব না। তারা রোশনাইতে ভিড়ে গিয়েছে। এখন তাদের খোঁজা মানে আত্মহননকে খোঁজা।

মূর্তি দালান মুখ

শহরের খবরই বলবার ছিল। পাথরগুলো ফাটছে। এত বছরের ঝড়জলরোদ-খাওয়া পাথর। একের পর এক খোদাইকরা অক্ষরের ভাঙচুরে যেন অন্য এক ভাষার ছাঁচ। মূর্তি এবং দালানের গোড়ায় অসম্ভব তাপের কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। কিন্তু আমাকে চুপ ক'রে থাকতে হল। আমার একান্ত কাছের মুখগুলো বরফের মতো গ'লে যাচ্ছে দেখলাম।

তোমরা গান গাও

কোনো বিদায়-সম্ভাষণ নেই
তবু সমস্ত ধ্বনি নিরুদ্দেশে যায়,
সঞ্চিত জলে দিনের স্তবক লুটিয়ে পড়েছে

মাটির গহ্বরে তা ছড়াতে হবে
একটি রক্তপাত আছে
দাবদাহের,
কেবল সেই শুভ্রতার উপহারকে যেন রাখা হয়
আসন্ন মেঘের নিচে।

জানলায় দিগন্ত ভেসে উঠেছে
এ-জায়গাটুকু যে এমন পরিসর পাবে
কল্পনা করিনি ;
চলাফেরা বসায় গ্রহান্তরের হাওয়া
সাঁঝবাতির চারপাশের নিঃসীমতা নিয়ে
ছায়ার সাগর স্ফীত হয়েছে :
আহা রাত্রি—প্রবালের রহস্য—অগোচর রূপান্তর।

কোনো বিদায়-সম্ভাষণ নেই
তবু সমস্ত ধ্বনি নিরুদ্দেশে যায়।
তোমরা যারা এসেছো
গাও তোমরা গান গাও
পরিশুদ্ধ আবেগে কণ্ঠ খোলো,
তোমাদের স্বর আমাকে বিসর্জন দিক
আকাশ-পরিধির সীমায়
অপেক্ষার সময়ের অন্ত পারে।

বেলা প'ড়ে এসেছে

বেলা প'ড়ে এসেছে। ভিটের উপর থেকে আশ্চর্যভাবে আলো স'রে গেল আর তার শাড়িতে জড়ো হল অনেক ছায়া। দাওয়ায় থামে দাঁড়িয়ে সমস্ত মাঠটাকে সে নরম হতে দেখল। সামনের যে-থাম রোদের গর্জনে ভ'রে ছিল, সেখানে মৃদু গলা ফুটছে। যেন কেউ নতুন ঘনিষ্ঠতার দিকে ঠোঁট খুলছে।

ধাপের উপর আস্তে পা রেখে সে নামল। তারপর পশ্চিমের গাঢ় রঙকে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে সীমানা পর্যন্ত হেঁটে গেল। বার বার ঐ পর্যন্ত সে গিয়েছে। বিদায়ের জন্যে, অভ্যর্থনার জন্যে। অজ্ঞাত সময়টাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখা টেনেছে একবার রোদ, একবার ছায়া। আবার সে ওখানে গিয়ে দাঁড়াল। ভয় এবং প্রত্যাশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চূড়াটাকে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা অদৃশ্য হয়েছে। আবছা উৎরাই বেয়ে কারা নামছে, তার মনে হল।

কয়েকটা পাখি ডানা গুটিয়ে মাটিতে নেমে বসেছিল, হাত নেড়ে সে তাদের আবার উড়িয়ে দিল ছায়ার পথে, অন্ধকারের দিকে।

ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে

ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে, চলো এখন শহর দেখিগে। ধুলো, লাল নীল কাচের টুকরো, ভাঙা পেন্তল, ঝাঁটি—ও-সবের চেয়ে কম আশ্চর্য নয় এই দিনের বেলার শহর। ওগুলো ঢাকা থাক, আমরা পথে ঘাটে ঘুরে আসি। কে জানে এমন কিছু হয়তো পেয়ে যাব যা কস্মিনকালেও পাইনি।

এই কথার পর ঘুণধরা হুড়কোটা নামিয়ে আমরা বেরোই।

বাস্তবিক তাক লাগাবার মতো শহর। সত্যিকার মায়াপুরী। এক এক জায়গায় রোদ জ'মে জ'মে যেন স্ফটিক হয়েছে। তা দিয়ে কতগুলো গৌরবের স্তম্ভ তোলা যেতে পারে ভাবি। অনেক চিৎকারের এক বিশাল প্রসাদের সামনে গিয়ে পড়ি। সেখানে আমরা কোনো কথা বললে তা আর আমাদের থাকে না, কিছুতেই থাকে না। শহরের মাঝখানে দেখি রাবণের চিতার মতো আগুনে আকাশ রাঙা। আমাদের সব উত্তাপ বুঝি ঐ কেন্দ্রে জমা থাকে। অথচ এক কোণে, অনুমান করি, কোনো গাছ মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নম্র হয়ে আছে। তাকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু কাছাকাছি অনবরত মৃদু গুঞ্জন। এবং মনে হয় সূর্যের ভিতরে মধু ঝরছে।

কতক্ষণ ধ'রে কত অলিগলি রাস্তা পার হয়ে হঠাৎ বিরাট মোড়। সেখান থেকে শুধু আমাদের বাড়ির পথটাই চিহ্ন-দেওয়া। আর সব দিক অপার সমুদ্রের মতো।

খালি হাতে ফেরার সময় আবছা হাওয়ায় ঘেরা ঘুমজড়ানো একটা কচি গলা আমার কানের কাছে বলে, ব'লেই চলে : "কাল যখন ঝাঁপি খোলা হবে, দেখো না কী মজা হয়···কাল যখন ঝাঁপি ··· ···"

মুঠোটা খোলা

কামারশালে জিম ধরেছে
লোহাগুলো ঠাণ্ডায় শোয়ানো
ভারি দুটো পাজা ডানার মতো মোড়া ;
একটু পরেই জলবার কেন্দ্রটা লুপ্ত হবে
নিবিড় মেরু থেকে তুষার এসে জমবে,
তার নিচে অসাড় ঘুম।

ভীষণ কুসফুসের আওয়াজে
পথিকরা থমকে গিয়েছিল,
বুকে হাত চেপে তারা ঘরে ফিরেছে
তারপর দুঃস্বপ্নের শিকার হয়েছে।
তারা দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পেত
জবরদস্ত মুঠোটা
এখন সামনের গাছপালার দিকে খোলা
এবং গোটাকয়েক রেখা
ক্ষুধা আর মৃত্যুকে নিয়ে এলিয়ে পড়েছে।

গ্রীষ্মকেই তারা

গ্রীষ্মকেই তারা উৎস ব'লে জানে।

তাদের প্রণয় বা বন্ধুত্ব কোনো ধারাজলে পুষ্ট হয়নি। রক্তের মুখে উষ্ণ হাতের চাপ তাদের অনুভবে রয়েছে। কাঁকরে আর আগাছায় তাদের শরীর ছিঁড়েছিল এবং সেই প্রথম তারা দিনের ভগ্নাংশগুলোকে একত্র হয়ে তপ্তকাঞ্চন বর্ণে ফুটতে দেখেছিল। তখন থেকেই মমতার জাদু তাদের সামনে দুপুরের আচ্ছন্ন বীথি মেলে রেখেছে। তারা রোজ

সেখানে দু-একও পা এগিয়ে দেয় এবং স্মরণে আনবার চেষ্টা করে কোন কোন উত্তাপের লয়ে তারা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আরও বড় ক্ষত যখন গোপনে বুকের ভিতর হয় তখন আঁধি আছে। ধুলোর ঘূর্ণিতে উত্তাল বাঁচায় আবার তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেয়। সেখানে অবশ্য একটুও স্থিতি নেই। কিন্তু তারপরই তো চুম্বনের লালে শেষ বেলাকে চলতে দেখার শান্তি।

কোথায় এক রাজ্যে নাকি বিশল্যকরণী জন্মায়। তার অলৌকিক কাহিনী তারা প্রায়ই শোনে। কিন্তু রোদের বাস্তব থেকে মেরুসমান দূরে সে কি কোনো মৃত দেশ নয়? হঠাৎ উন্মনা হয়ে যাওয়ার পর তারা আবার স্পষ্টতায় ফিরে আসে। গ্রীষ্মের কাছে বিদায় নিলে ভীষণ একলার পথ শুরু হয়, তারা ভাবে।

কোনো চিহ্ন নেই

আরোগ্যের জন্যে কয়েকটি কথা প্রথমেই তাদের মনে এসেছিল। যেমন—নদী, যেমন—সূর্য, যেমন—প্রেম। শুধু মনে আসা নয়, তারও বেশি। এই সব শব্দের চিত্র তারা তাদের স্বভাবে মুদ্রিত করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল জীবনের মূলকে তারা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাকে এক বিশুদ্ধতায় তারা সঞ্চারিত করতে পারবে।

তাদের আশ্রয়ের জমিতে পলি পড়ে কিনা তারা অবশ্য জানত না। কিন্তু নির্জনে তাদের কথোপকথন উর্বর হত। যে-কোনো ধ্বনি, তা জলের গতিরই হোক বা মাটির বিস্ফারেরই হোক বা তাপের স্পন্দনেরই হোক, তাদের বাক্যে মিশত। যেভাবে চোখের দেখার সঙ্গে ঘুম মেশে।

প্লাবন আর আগুনের সর্বনাশকে তারা মনে ঠাঁই দেয়নি। অথচ শতাব্দীর গুহার মধ্যে এক ভীষণ উপস্থিতি তাদের নিকটেই ছিল। তারা ভাবেনি তাদের আবিষ্কৃত উষ্ণতা এবং শীতলতার পরে চূড়ান্ত আর কিছু ঘটতে পারে। গাঢ় বিনিময় তারা একসঙ্গে অনেক করেছে, কিন্তু তাদের জানা ছিল না নির্ভরকে কুরে খাবার পোকা প্রত্যেক নিঃশ্বাসে

পিলপিল করে। এবং তাদের জানা ছিল না মাহুষের মুখ ছুঁয়ে 'এই আরোগ্য' বলতে গিয়ে বাতাস এক সময় হাহাকার ক'রে ওঠে।

তাদের আশ্রয়ের কোনো চিহ্ন নেই এখন। একটা সমাধির পাথরও না :

কেন এই সান্ত্বনা

ফলের ছবিতে দুরন্ত রং
শূন্য ঘটে উৎসব আঁকা রয়েছে।
এখানে এমনিই হয়
এখানে কোনো শোভাই মঞ্জরিত হয় না,
ঘনিষ্ঠতার দান এমনি উদ্ধত
এই বালির উপরে ;
অথচ আমি বনভূমি দেখেছি, শস্য দেখেছি
আমি জলে প্রিয় মুখের প্রতিবিম্ব দেখেছি,
তুমি বৃষ্টির ঝলক নিয়ে এসেছিলে,
ফুলপাতা ঝ'রে যাওয়ার পর
একটা রাত নিয়ে এসেছিলে কুঁড়ি ধরাবার।
তবে কেন এই সান্ত্বনা
কেন এই কাগজের ফুল ?

আরো কত প্রস্ফুটন

আমি মৃত্যুর কথা বলিনি
তাকে আমার অন্তরের অন্তস্তলে রেখেছিলাম,
তারই উৎসে আমার প্রেম
আমার উজ্জীবনের আবেগ।
ঘাসের প্রান্তে আমাদের বিদায়ের পথ
আর এক গৌরবের অভিমুখে ছিল,
জ্যোৎস্নায় মৃত ফুলদের দেখে
আমি হৃদয়ের স্রোতে চমৎকৃত হয়েছি :
আরো কত প্রস্ফুটন

আরো কত রক্তবিন্দুর মাধুর্য।
সব আরক্ত এখনো আমাদের ধমনীতে সঞ্চিত আছে,
তুমি থামতে চেয়ো না
আমরা মুক্তির আভায় আবার আপ্লুত হব।

রাস্তায়

ভোরের দিকে এই এক সুষমা :
দু-ধারে দেয়াল দরোজা আবছা
রাস্তায় ধুলো শান্ত শুয়ে আছে
আঁজলা ক'রে তুলে ছিটিয়ে দাও
অমনি যেন মধুবৃষ্টি হবে।
তোমার জন্যে অভ্যর্থনা রেণুতে রেণুতে,
বিভোর নদীতে পৌঁছে দিয়ে
তোমাকে আশ্চর্য ক'রে দেবে।

তুমি যে হিংস্র রোদে বেরিয়ে এসেছিলে
তোমার পড়ন্ত বেলা রক্তাক্ত জ্বলছিল
চেনা অচেনা মুখের যন্ত্রণায়
তোমার অন্ধকার চৌচির হয়েছিল
নিঃশ্বাস পড়া এবং থামার মধ্যে যে আর তফাত করা যায়নি
এ-সব ভুলে যাবার ইতিহাস,
তুমি যেন এক বিদেশী বন্ধু নতুন এলে
তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে মৃদু স্রোতে
গুঞ্জনের মধ্যে,
কুয়াশার মোড় তোমাকে ইশারা দেয়।
অথচ ভালো ক'রে ভাখো
ধুলোর উপর লাল ছোপগুলো কী ভীষণ তাজা।

অন্ত্য পর্ব

বান এসে কি ধুয়ে মুছে দেবে? এমন তো কতবার হয়েছে। কিন্তু এ-প্রশ্ন ঘুমের ঠিক আগের, যখন আমরা অনিশ্চয়ের উপর মাথা রেখে শুই। এখন আমি তোমার সঙ্গে স্বচ্ছতায় এসেছি। তোমার উন্মত্ত প্রান্তর তার আন্দোলিত মুহূর্তগুলো আমার রক্তে ঢেলে দিয়েছে। আমাদের ভাবনায় প্রতিশ্রুতির সম্ভার।

তোমার অভিলাষ সারা এলাকায় তুমি ছড়িয়ে দিয়েছো। নিকট দূর দেখি একই বিভায় ঘনিষ্ঠ। মনে হয়, পৃথিবীতে যত সোনা আছে তার রং তুমি অঁাজলায় ধরতে পারো।

কোন গুচ্ছকে তুমি একান্তে উৎসর্গ করেছো? দিনের বেলায় এই প্রশ্ন আমি তোমার কাছে রাখি। একটা শীষ আমার চোখের মণিতে প্রতিফলিত রয়েছে। তাকে যেন আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি যখন অনিশ্চয়ের উপর মাথা রেখে আমরা ঘুমিয়েছিলাম।

তুমি হাত তুলে ইঙ্গিত করো। তোমার তর্জনীতে একটা জলের কণা চিকচিক করে। সে তোমার অশ্রু, না শিশির তা কখনো জানব না, জানতে চাইব না।

ভাঙন

ভাঙন একেবারে সামনে এসে গেছে,
ক্রোশের পর ক্রোশ উল্টেপাল্টে অন্যরকম
উৎকীর্ণ নির্দেশগুলো একটাও আর নেই
অথচ তাদের অবিনশ্বরই মনে হত।

আমাদের তালাবন্ধ শহরটা হাট হয়ে যায়
আড়াল আব্‌ডাল আগল সমস্তই ঘোচে,
এখান দিয়েই দিগন্তের বল্গাহীন ঘোড়া ছুটে যাবে বুঝতে পারি,
যে-সব লোহালক্কড় দারুণ ভারগম্ভীর হয়ে ছিল
তারা এক পেল্লায় হাসিতে মেতে ওঠে।

অতুল হাওয়ায় আমরা,
তার তীব্র শিখরের পথে পা রাখি
যেখানে আগে পাতারা দুরন্ত নাচত,
আমরা এক প্রবল প্রমত্ত গান শুনি।

টিমটিমে বাতিটা তুমি অষ্টপ্রহর আগলাতে
সেটা অপরিমেয় গহ্বরে তলিয়ে যায়.
তোমার মুহূর্ত-আলোর মুখ বুঝি অদৃশ্য হয়
কিন্তু না
তোমার অনির্বাণ কথার উজ্জ্বলতা নিয়ে
আবার অপরূপ ফোটে,
একটা ছেঁড়াখোঁড়া কাঁচা শিকড় রাত্রিকে জড়িয়েছে
তারই উপর তোমার মুখের নক্ষত্র :
সেই আমার নতুন চোখ আজ।

জন্মভূমিতে

প্রপাত আমি দেখিনি। আচমকা জল আর পাথরে কেউ কেউ গম্ভীর আশ্বাস শুনতে পেয়ে আমাকে এসে বলেছে। কিন্তু ও-কথা আমার কাছে যথেষ্ট নয়। আমার নিরিখ এই : আমি তার একান্ত নিকট হতে পারি কিনা, সে কতখানি যন্ত্রণা কতখানি-আকুলিবিকুলি কতখানি ছোঁয়া আমাকে দিতে পারে। এর কোনো সঠিক উত্তর না পাওয়ায় আমি আর আগ্রহ বোধ করিনি : আমার মনে হয়েছে, তুমুল লাফের মধ্যে শক্তি অবশ্যই আছে, কিন্তু তার আশেপাশে এমন সব লিপ্সার দৈত্য বড় হয় যারা আমার আত্মার সঙ্গে শত্রুতা না ক'রে পারে না।

নিশ্চয়তার আর এক নাম জন্মভূমি। আমার জন্মভূমি আমাকে হঠাৎ দিশেহারা করে না। আমি নামতে পারি না এমন কোনো খাদ এখানে নেই, আমি এগিয়ে যেতে পারি না এমন কোনো পথ এখানে নেই। সে আমাকে খুব দুঃখ দেয়, আমাকে খুবই আপন করে। এবং আমাকে সে তীব্রতম প্রতীক্ষায় রাখে।

বাড়ানো ঘাসমাটির সমতলে আমার জন্মভূমি আমাকে সব চিনিয়েছে। যখন শস্য ছিল তখন শস্য দিয়ে এক-একটা মস্ত চিহ্ন ফেলেছে। শস্য লোপাট হওয়ার পর সেই চিহ্নগুলোকে আরো পরিস্ফুট করেছে।

না, আমার বাঁচবার চৌহদ্দিতে কোনো জলের গর্জন নেই। শুধু একটা মন্থর প্রবাহ আছে। মাঝে মাঝে তাও আবার যায়-যায় হয়। সূর্য তাকে অনেকখানি শুষে নেয়। কিন্তু কখনো তা একেবারে মরে না। অঁাজলা ক'রে তৃষ্ণা জুড়োবার জল আমি যে-কোনো সময় পাই।

আমি জানি এই প্রবাহ একদিন আমার ভস্ম ব'য়ে নিয়ে যাবে। এবং আমি জানি এই জলে একদিন আমার আকাঙ্ক্ষারা ফ'লে উঠবে। এই প্রবাহ আমি চৈত্রেও তোমাকে দেখাই :

কুয়াশায়

শহরের মানুষজন কুয়াশায় হাঁটছিল। তাদের টুপিখোলা অভ্যর্থনা অনেক আগেই উবে গিয়েছিল। জানলাদরজা লোপাট ক'রে দেয়ালগুলো ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছিল। গির্জার ঘড়িতে ছটা বাজতে আমি আন্দাজ করেছিলাম এক্ষুনি নিশুতি হবে। তুষারপাত না হলেও তুষারপাতের কথা আমি ভাবছিলাম। জামাটামা টেনে আমি লুপ্ত হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম। ঠিক তখনই শেষ ঝলকটা আমার উপর পড়ল। বিশ্রুত ধূসর জাদুঘর ছাড়িয়ে যেই নদীর বাঁধে পা দিয়েছি।

টিয়াপাখিদের ওড়া শুরু হলে শীগ্‌গির আর থামবে না। এই আলোয় তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফিরতে থাকবে। তাদের জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। পুকুরের ধারে গাছগাছালি কাঁপছে। ক্ষেতের পর ক্ষেতের মাটি অধীর হয়ে উঠেছে। লাঙল কাঁধে যে-লোকটা কুঁড়েঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার কপাল থেকে আগুনের ফোঁটাগুলো ঝ'রেও ঝরছে না। জঙ্গল পরিষ্কার হয়নি, একটা ছুটো ক'রে শেয়াল সন্ধের আড়ালে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু জঙ্গলের গহনে এক দ্যুতি রয়েছে। সমস্ত স্রোতের শিকড় সেইখানে গাড়া।

আমার নির্বাসিত শরীর অন্তরঙ্গ আলোয় স্থাপিত হল। আমি ছোটবড় গলায় আমার ভাষা শুনলাম। আমি বিম্বিত হলাম স্বদেশের হৃদয়ে।

শীতের ঘরে

আমি শীতের ঘরে শুয়ে থাকি
অনেকগুলো বছরের তাপ
বিষুবরেখায় গণ্ডিতে ঘেরা রয়েছে
এবং আমার স্নেহ কোনোদিন
মুষলধারা বৃষ্টিও আর পায় না।
আমি ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হয়ে
বরফের যুগের বিকেলকে দেখি
তারপর লোমঅলা বস্তার মধ্যে সেঁধোই
যেন কোনো সাদা ইঁদুর আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে,
মুখ বের ক'রে আমার নিঃশ্বাস নেওয়ার সাক্ষী
নির্বিকার খাট আলমারি সোফা টেবিল,
আমার বুকপেটের কাছে তাতানো ইটগুলো
বরফে ধুয়ে ধুয়ে উত্তর মেরুর ঘুম নিয়ে আসে.
দাঁতে দাঁত চেপে শীত
আমার কানে ফিসফিস করে,
আমি বন্ধ চোখে
তুষারঝড়ায় মাথা রাখার জন্যে ব্যাকুল হই।

ভাগ্যিস পাশের কুঠুরিটা ছিল
সেখানে ধুসর আঙারের ধারে নতুন বুড়িমা
মৃত্যুর মুঠো থেকে গলা বাড়িয়ে কথা বলে
আমার নামের শব্দ আঁকড়ে ধরে
আর বিদায় নিতে হবে ব'লে ফুঁপিয়ে ওঠে।
তার কান্না আমাকে রোদ্দুরের দিকে ঘুরিয়ে দেয়
আমি মৌসুমীর দেশে ফিরবার রাস্তা দেখতে পাই।

আবার

আমি কয়েক পা চলি
আবার হাঁড়িকুড়ি ছাই ভাঙা উনুন,
জামাকাপড়ের আঁশ শিমুলের মতো ওড়ে,
পাথরের অক্ষরগুলোয় নোনা ধরেছে
তবু তাদের চিৎকার থামেনি।
গাছের পাতায় পুরোনো বৃষ্টি দেখি
বৃষ্টির পর লাল সবুজের রেওয়াজ,
মাটির এলোপাথাড়ি খেলা সেই উঠোনে
উঠোন থেকে রাস্তায়,
হাহা দরোজা কান্নায় গানের সুর ধোঁয়া
পাথুরে চিৎকার জড়িয়ে অন্ধ ভিখিরি।

আমি কয়েক পা চলি
আবার কাঁচের ঘরে আলো,
ঘরের মধ্যে আলোর
নখদাঁত-গুটোনো মহত্ত্ব,
ভীষণ বিজয়ের আবহাওয়ায়
ক্রমাগত নড়াচড়া
ক্লান্ত হওয়া,
মিনিটগুলো চিরে চিরে কাঁচের শব্দ :
"জানো হে, এই হল ভালোবাসা।"

অপেক্ষা

টুঁ শব্দটি নয়, শুধু তাকিয়ে থাকো। জাদুকর, মানে যাকে জাদুকর মনে হয়, তার ভয়বাহ গলা শুনে যারা অত্যাশ্চর্য দৃশ্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে তারা নিজেদের টুঁটির উপর হাত রাখে। অনেকক্ষণ রেখে দেয়, পাছে সব পণ্ড হয় এই ভেবে। সিংহদ্বারে তারা ব'সে আছে। ভিতরটা তাদের চোখে প্রতিভাত হলে তারা জীবন 'এমন চমৎকার' বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়বার অবসর পাবে। কিন্তু ব'সে থাকার এই

এতখানি সময়টা খুবই বেয়াড়া। তার মৃতদেহ হয়ে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আর অবয়বকেও বিশ্বাস নেই। রক্ত যদি আগুনের দিকে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে চলে তাহলে যে-প্রচণ্ড শব্দের মুহূর্ত এগিয়ে আসবে তার নানান্ রকম অনুভব আসে। বিরাট পাল্লা দুটোর উপর যারা নজর রেখেছে তারা মন্ত্র আর বিস্ফোরণের মাঝখানে অপেক্ষা করে।

নিয়ন-আলোর ভিতরে

নিয়ন-আলোর ভিতরে ঘরবাড়ি নটনটী। আমার সঙ্গের ভাবনা-চিন্তাগুলো আমি পায়ের নিচে মাটিতে চেপে ধরেছি এবং চোখের সামনে এই নীলকে অপার্থিব সত্য হয়ে জ্বলতে দিয়েছি। কারো কোনো চেনাচিনির ধাঁধা নেই, সাজসজ্জা রং আসবাবপত্র উষ্ণ ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে।

আপাদমস্তক সমস্যার ব্যবহারে রাত ঘোরালো হয়। আর দেরি সয় না। চলো এবার ভারহীনতার চূড়ান্তে উঠে যাই। শিকড়গুলো কাটা হয়ে গেছে, আমাদের বুকের মধ্যে আর কোনো অভিকর্ষ নেই। আমাদের মেদমজ্জা একশো কোটি যন্ত্রণার বাইরে রয়েছে। এসো এইবার তাদের মহাশূন্যে বাজাই।

গূঢ় আলাপের যতখানি নিকটে আসা যায়, আমি এসে পড়েছি। এখন বানানো দিগন্তে সূর্য ওঠার খাতিরে আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে।

স্মৃতি

কোয়ারির ঝাউ তার জন্যে দুখ করে না,
অন্ধকার ভুকার ঘর
তার আভাস দেয় না
তবু তার অপ্রতিহত স্মৃতি রয়েছে,
দিনরাতের বৃত্ত যতই ছড়িয়ে যায়
ততই সে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে :
সমুদ্র ক্ষেত বালিয়াড়ি এবং অরণ্য এবং সার্থবাহ-পথ
তাকে অমোঘভাবে রেখেছে,

কারণ সে দিনগত কোটর ছেড়ে দিশতে গিয়েছিল
তার তৈরি স্বপ্নলোকে
সে কুটিকুটি ক'রে উড়িয়ে দিয়েছিল
যাতে তারুন অজ্ঞাত দেশ আর উজ্জীবনের কথা
আমরা ভাবতে পারি,
কারণ সে জেনেছিল
শব্দের ভিতরে কোনো ওষধি নেই,
স্বরবর্ণের রং অথবা অভিধার ছটা
দৃষ্টিহীনতায় মরতে থাকে।

একদা তার অলৌকিক হাত
বাক্যের যবনিকা উঠিয়েছিল,
প্রতি অক্ষর তার কাছে যেন স্পর্শমণি
তাদের জোড়া লাগিয়ে সে বলেছিল :
তারা থেকে তারায় হার টাঙিয়ে দিলাম।
তারপরই হঠাৎ দেখেছিল
লক্ষকোটি চোখ
মাটির দিকে একাগ্র চেয়ে আছে।

কত উষ্ণতাই বা আমরা দিতে পারি ?
একটা শব্দ একটা অক্ষরও
মৃত রাজ্যের সীমা পার হবে না।
তাদের বুকে ধ'রেই বুঝি
তারা আমাদের ধমনী থেকে অনেক দূরে গ্রথিত
আমাদের রূপান্তর থেকে
আমাদের বিকিরণ থেকে অনেক দূরে গ্রথিত।
সম্বৎসরের মেলায় এই সব খেলনা
তার স্মৃতিকে অক্ষর নির্মম ক'রে রাখে।

দিগ্বিজয়

শব্দগুলোকে আমি চমৎকারভাবে সাজিয়েছিলাম। মিল অমিল সমস্ত নিয়ে এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ। লড়াই শুরু হতেই সেটা প্রমাণিত হল। ত্রিলোকপুরে আমি পর্ব চলিয়ে দিলাম। নিকষ কালোয় আমার চোখ শতসহস্র পত্তন দেখল নোঙর-করা কত নৌকো দড়িদড়া ছিঁড়ে সর্বনাশে ভেসে গেল। যেন যেন ছেলেখেলা এমন তুলকালাম। আকাশ বাতাস আমি আওয়াজে আওয়াজে দলে তাল পাকিয়ে দিলাম। কিছু রাস্তাঘাটে একদা চলাফেরা করতাম। সেগুলো ছত্রখান হল। মারাত্মক নেশায় আমার রক্ত নাচতে লাগল।

কোনো মুহূর্তে আমার শরীরটাকে হয়তো একলা বিছানায় শোয়াতে চেয়েছি। নেশা একটু পাতলা হয়ে এলে এমন হয়েছে কিন্তু নতুন শব্দকে ছুঁয়ে আমি আবার পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছি আমার বিছানাও এক রণক্ষেত্র লড়াই বুঝে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সেও এক লড়াই বটে। ধমাক্ত হয়ে আমি একের পর এক অবরোধ ভেঙেছি, কথায় চড়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছি, কল্পনা যতখানি যেতে পারে আমি হাড়মাংসের আড়ালকে বিধ্বস্ত করেছি। এবং তারপর রসিয়ে রসিয়ে আমার বিক্রমের আস্বাদ নিয়েছি

কিন্তু কার সঙ্গে এতক্ষণ লড়লাম? কে জানে কার সঙ্গে? অথচ আমি যে লড়েছি তাতে সন্দেহ নেই। এখনো উন্মাদনা আমার স্নায়ুতে ঝমঝম করছে। আমার ক্ষমতাকে তো আমি জাহির করেছি। বাহবার জন্যে আমি গোড়া থেকেই কান পেতে ছিলাম। অক্ষরের ঝঙ্কারে দিগ্বিদিক বাজিয়েছি এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বাহবা শুনেছি। আরো শুনছি। তবে ময়দান আর জঙ্গল বড় প্রবঞ্চক। হাততালি একজনের, না, লাখলাখের ঠিক ধরা যায় না। আমার বিজয়ী চোখ এখন আমি উপরে ঘুরিয়েছি। সেখানে নাকি তারা থেকে তারায় হার টাঙানো হয়

কথাকাহিনী

টালমাটাল আমরা কেউ এড়াতে পারছিলাম না। কেবলই ভাবছিলাম যদি একটা দ্বীপ পাওয়া যায়। নিজেদের গুরুত্ব অনুভব করবার জন্যে যেখানে স্থির হয়ে বসতে পারি।

যে-সময়টা আমরা নির্বাচন করেছিলাম সেটা গোধূলি, যখন একটু হাওয়া দিলে সোনার শীষ জোটে। কখনো মেঘ কখনো রোদ্দুর এমন নয়। নিয়মিত রাপা আলো। কিন্তু কোথায় জড়ো হব আমরা? অবশেষে কল্পনাই পথ দেখাল। আমরা মনে মনে একটা জায়গা তৈরি ক'রে নিলাম এবং সেখানে বসার ভান করলাম। অবশ্য এই আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে যে আমাদের ভঙ্গি বাস্তবে গ্রথিত হয়ে যাবে। কত সত্যই তো অভ্যেস থেকে জন্মায়। তবু সর্বক্ষণের এক অস্বস্তি জেগে থাকল: আমাদের নিচে অগ্নিগিরি আছে। চারদিকে ভেতরে ভেতরে যখন উথলপাথল চলে তখন স্বাভাবিকভাবেই একটা লাভামুখ খুলে যেতে পারে সেই সম্ভাবনা ভাবতে না চেয়েও আমরা মনে মনে পাথর টের পাচ্ছিলাম। সেখানে কোনো বীজ নেই, কখনো কোনো বীজ পড়েনি।

যাই হোক, আমরা বসলাম অর্থাৎ বসার ভান করলাম। অতঃপর পাঁজরের মধ্যে অসম্ভব কথা ভ'রে নিয়ে বুদ্বুদ বানানো শুরু হল। আমার বুক চেপে ধ'রে আমি শব্দের পর শব্দ আওড়ে গেলাম।

তখন থেকে আমি

সমস্ত রাস্তা আমার সামনে ঝকমক করত। পুরোপুরি স্পষ্ট। পথ ক'রে কখনো কখনো আমি চোখ বুঁজেই হাঁটতাম। আমি জানতাম আমার পা বাড়ানোর জায়গাগুলো রোদে জ্যোৎস্নায় ছককাটা রয়েছে। খুব সমঝদার আলো, তার জন্যে আমার ভাবভঙ্গি পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কোনো ব্যাখ্যার দরকার হত না, আমাকে দেখা মানেই আশ্বস্ত হওয়া। আমি যেন এক দিগদর্শী নাবিক, যে জানে কী ক'রে চোরা পাহাড় থেকে বাঁচতে হয়, কী ক'রে ঝড়ের বৃত্ত এড়িয়ে বন্দরে ভিড়তে হয়।

এখনকার কথা একেবারে উল্টো। এখন আমি প্রচণ্ড হাওয়ায় গাজছে, যেখানে আলো অন্ধকারে তফাত করা বৃথা। ব্যাপারটা যে কী ভাবে ঘটল বলা মুশকিল। বলতে হলে বলতে হয়: এই অন্ধ এলাকা কোথাও ওৎ পেতে ছিল, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। ব্যস, আমার সে-বিখ্যাত রাস্তাগুলো অমনি বেমালুম উবে গেল। আমার জানে এ-এলাকা আমি আগে কখনো দেখিনি। অথচ—এটাই সব

চেয়ে উল্লেখযোগ্য—তাকে আমার কিছুই মনে হল না। জন্মের পরেই তাকে যেন একবার অনুভব করেছিলাম। কিন্তু আমার বাহাদুরির আড়ালেই তা ছিল, কাছেই ছিল। সুতরাং আশ্চর্য হলাম বটে, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠতাও বোধ করলাম। জন্মের পরিচয় হলে যেরকম বোধ করা যায়। তখন থেকে আমি ঘূর্ণির বাসিন্দা হয়েছি।

একটি সূর্যাস্ত

সোনার রোদে অস্ত্রগুলো ফুটে উঠেছে
রক্তস্রোতেও আহামরি আভা।
আমি একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছি,
দৃশ্যের এমন বদল আমি কি ভাবতেও পেরেছিলাম কখনো ?
আমার সামনে ছিল ধানক্ষেত সোহাগী মাটি
দৃষ্টির সীমায় নদীর রহস্য।
সেখানে অন্ধকার ফেটে বেরিয়ে চারাগুলো বাড়ছিল,
জোয়ান জোয়ান হাত
আকাশটাকে খুব উঁচু ক'রে তুলে ধরেছিল
এবং ছেলেমেয়েরা প্রজাপতিদের সঙ্গে ঘুরঘুর করছিল।

এ যাবৎ কোনো দিনান্তই আমাকে নাড়া দেয়নি,
কিন্তু আমার সাধ ছিল বলবার মতো একটা সূর্যাস্ত দেখব।
তা, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত,
অতঃপর বারান্দাটা যদি ভেঙে পড়ে পড়ুক
এই মুহূর্তে বিধ্বস্ত সূর্য ঝুলে পড়েছে
এবং ইস্পাতের পঙ্গপালের উপর সোনা ঢালছে,
আমি যাদের দেখেছিলাম তারা কেউ আর স্পষ্ট নেই
কেননা তারা শত্রুর গলা জড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে রয়েছে,
আমি বারান্দায় স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
তীব্র উজ্জ্বল ঝলক থেকে
আমার উপর রক্তের রং ঠিকরে পড়ছে।
আমি এক অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখছি।

পুতুলনাচ

পুতুলরা এখন রীতিমতো মানুষ
ওদের নাচ চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে,
মঞ্চটঞ্চ নেই, খুব ঘনিষ্ঠভাবে
ঘরে বাইরে : আস্তানায় এবং জমায়েতে।
যদি কোনো সময় কাউকে ছোঁও
নিশ্চয় তাপ টের পাবে
এবং দৈবাৎ কারো চোট লাগলে
হয়তো রক্তও পড়বে,
পুতুলদের শরীর মানুষের মতো হয়েছে,
হাতপা যতই সুতোর টানে নড়ুক
যথেষ্ট আবেগ ফোটাতে পারে,
আরো আশ্চর্য, ওরা কথা বলতে শিখেছে
মজার মজার কথা
ছুঁড়ে দিলে জাঁদরেল মানে দাঁড়ায় এমন সব কথা

চোখ-রাঙানো পুতুল
দে-দোল-দোল পুতুল
কলম-নাচানো পুতুল
আপ্‌নি-মোড়ল পুতুল
বোম্বাই গানের পুতুল
পার্টিতে যাবার পুতুল
তোতা-বুলির পুতুল
ফুলদানের পুতুল
তালি বাজাবার পুতুল
কানা গলির পুতুল।

অতুলনীয়

চার দেয়ালের ছবিগুলোই তো আমার প্রতিভা,
সেখানে দ্যাখো সকাল বিস্ফোরিত হচ্ছে,
কয়েকটা মুখ যেন সূর্য
বিরাট জমায়েতকে ডাক দিয়েছে।
অবিশ্যি মেঝের কাছে এবং উপরের দিকে
ছায়া-ছায়া
শীতল পাটি সোনালি মাছ পানের বাটা বালিশ
এবং তৈরি হাওয়ার মধ্যে হিসেবনিকেশ।
এ-সব না হলে আমি ছবি বাছাই করতে পারি না,
আমি দুর্দান্ত মুখ ফোটাতে পারি না
দেয়ালে।

তবে এমনও হতে পারে
দেয়ালগুলো তেমন নজরে পড়ল না,
তাতে খুব একটা ক্ষতি নেই
যেহেতু আমার শানানো গলা আছে,
তোমাদের দিকে ঘুরলেই
আমার কথায় ফুলকি ছোটে
আগুনের মিছিল তোরণ তোরণ সাধের নগরী।
অবিশ্যি আমার এক অনাত্মিক গলা আছে
তা দিয়ে আমি পড়তা ফেলি প্রার্থনা করি
ঠাণ্ডা চৌবাচ্চার ধারে স্বর ভাঁজি।

সে যাই হোক, তোমাদের যখন সম্বোধন করি
আমি অতুলনীয় হয়ে যাই।

উপরে ওঠা

ক্রমেই উপরে উঠছি
একবার বাঁয়ে হেলে একবার ডাইনে
প্রথমে ট্রামে বাসে তারপর মোটরে
কখনো বা প্লেনেও চড়ছি।
রাস্তা অত্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী,
আমি নিশ্চিত আছি
শীগ্‌গির মাথায় নক্ষত্র-মুকুট পরব।

কিছু ঝাঁকুনি অবশ্যই আছে
মানবিক উদ্গম কবেই বা নিষ্কম্প হয়?
কিন্তু আমার প্রথম পদক্ষেপ অভ্রান্ত হয়েছিল
মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝতে দেরি হয়নি
তাই উঠছি ক্রমেই উপরে উঠছি,
ঘুমভাঙা থেকে আবার ঘুমোনো পর্যন্ত
কেবলই উত্তরণ,
স্বপ্নেও অতুলনীয় চূড়া,
আমার যাত্রায় কোনো ফাঁকি নেই।

মাঝে মাঝে একটু থামতে হয়
সে তো হবেই, তৃষ্ণা আছে,
দুটো ঠোঁট সমস্ত লোভনায় শরীর শুষে নিতে পারে
এমন তৃষ্ণা,
তখন এক গহনে প্রতিষ্ঠিত হই
প্রতিষ্ঠিত হই সেই রক্তে যা অন্য রক্ত ঝরাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব
তাতে বেশ শান্তি আসে।

মাঝে মাঝে অঞ্জলও পড়ে
উঁচুতে যদিও তা খুব প্রত্যাশিত নয়,
তবু অঞ্জল আমি ভালোবাসি

এখন যেমন বলছি,
বক্তৃতায় আমার শ্রী লোটে
আমার ভিতরে আমি সঙ্গীত শুনি
তার স্তরে স্তরে যেন আমার ওঠবার ধাপ।
এই বিভক্ত স্বভাবকে জাগিয়ে তুলে
আমি উপরে উঠছি,
এবার তুমুল হাততালিতে চ'ড়ে
আসল জায়গায় পৌঁছে যাব।

মুখোশ খুলে রেখেছি

আমি মুখোশ খুলে রেখেছি
এখন আমি তোমাদের সঙ্গে নই।

প্রতিভার খেলা মহত্ত্বের খেলা
কত দেখালাম :
শুকনো মাটিতে ফুঁ দিয়ে
আমি আতসবাজি ফোটালাম,
গম্বুজের উপর এক পা বাড়িয়ে দাঁড়ালাম
আত্মোৎসর্গের যে-চেহারাটা সবাই চেনে
তাকে শূন্যের পটে এঁকে দিলাম।
সেই দড়ির কৌশলও আমার জানা ছিল
কিন্তু দেখাইনি
যেহেতু জানতাম অদৃশ্য হওয়াটা
কাজের কথা নয়,
এতগুলো অবাক চোখের সামনে মন্ত্র ছাড়া ফুল,
অন্য উদ্যান যাকে মনে হয়
দেখতে না দেখতেই তা মরুভূমি হয়ে যেতে পারে।

আর এতগুলো কান যদি পাতা থাকে
তাহলে শব্দকেও বক্তৃতায় রাখতে হয়

সুতরাং আমার দুটো হাত শিঙে ক'রে
আমি অবিরাম ফুঁকলাম,
জীবন এবং মৃত্যু অবান্তর হয়ে গেল
এমনই উদাত্ত বাঁশির মতো শোনাল সেই আওয়াজ।

এই আমার একনাগাড় কেরামতি
সেখানে আমি কোনো ত্রুটি রাখিনি,
কিন্তু একটু বিশ্রাম তো আমার চাই
তাই এবার মুখোশ খুলে রেখেছি
এখন তোমরা আমার কাছে এসো না
এখন তোমরা আমার মুখ দেখতে চেয়ো না।

ঝাঁপ দেব

যে-সব ঘরে একটু বাদে কিছুই আর দেখা যাবে না
আমার মুখ সেখানে আলো দেবে—
এই কয়টি কথা
আমাদের কালো-কালো দেয়ালে বেজে উঠল
বারান্দায় উঠোনে আনাচে কানাচে ব'য়ে এল,
তখন রোদ যাব-যাব
অনিশ্চয়তা ক্রমেই আমাদের ঘিরে ফেলছে।
দর্শক আর শ্রোতারা আত্মীয় কণ্ঠ শুনে অবাক,
তারা সেই কবির দিকে
যেন কোনো সূর্যের দিকে ঘুরে গেল।
সংসারের শেষ বেলায় দাঁড়িয়ে
আমরা কিন্তু আবার অবাক হয়েই দেখলাম
মুখে চুমু দিয়ে মৃত্যু তখুনি তাকে শুইয়ে দিল।

যেহেতু কিছুই থেমে থাকে না
তাই আমাদের অস্তিত্ব রক্তে
হুজোড় লাগাবার কথা তখুনি আমরা ভাবলাম

আমরা মত্ত দর্শক এবং শ্রোতা।
আমরা গোধূলি পেরিয়েছি
আর এক পা এগুলেই চৌকাঠ ডিঙোব ;
পরিত্রাণের স্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেও
আরো বহু মজাদার ধ্বনি উৎসারিত হয়েছে :
মাদুরে উপর ঘোড়সওয়ারদের দাপাদাপি,
মাংসে কুরোনো চাপ যেন তুবড়ি খুলবে,
শ্যামবাজার বালিগঞ্জের কুকুরকুণ্ডলী
মুখুরায় ওঠে এবং নামে,
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে প্রখর ডাকে তোলপাড় করে,
পাতায় আগুন ছোঁয়ালে চারা পর্যন্ত জ্বলে যাবে
বাঁচার এমন স্বর।

এত ধ্বনির গাছে আমরা ডুবে মরব।
যদিও দশটা-পাঁচটারই গলা
তবু তার সুরের টুকরোগুলো
দারুণ আবেগে পরস্পরকে বাহবা দিয়ে ঘোরে।
সেই কবির কথা কয়টি ঠাণ্ডা হরফে লেখা থাক,
এখন দর্শক এবং শ্রোতা এবং মুখর-বক্তা
সবাই মিলে আমরা দেয়ালের ভিতরে ঝাঁপ দেব।

কাপ্তান আরো

কাপ্তান, আরো কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শিস্ দাও। তোমার আওয়াজে যারা বেরিয়ে এসেছে তারা যেন ঝিমিয়ে না পড়ে। তাদের রক্ত নাচাবার মতো ঢেউ তোলা চাই।

কাপ্তান, আরো কায়দাসে মিনার ফোঁকো। তোমার গুণপনা শুনে দূর দূর থেকে লোক এসে জুটেছে। তোমার ধোঁয়ার খেলায় তাদের তাক লাগানো চাই।

কাপ্তান, আরো জোড়ে কথা ছাড়ো। তোমার জন্যে গাল-গরজাম তৈরি রয়েছে। তোমার মুখে খই ফুটবে আর টগ্‌বগিয়ে ঘোড়া ছুটবে বুকে বুকে। একেবারে বিস্ফুরণ লাগিয়ে দেওয়া চাই, কাপ্তান।

একখানা গাইলে বটে

'একখানা গাইলে বটে তুমি' ব'লে আমি খুব তারিফ করলাম। আমাকেই করলাম। আমি কত বড় গুণী তা আমি বুঝি। আমার খোঁচখাঁচগুলো এমন সূক্ষ্ম হয় যে সরাসরি রক্তে গিয়ে পৌঁছয় এবং আমিই সেটা সবচেয়ে বেশি অনুভব করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং এবার আমার গুরুত্ব আমি আরো ভালো ক'রে উপলব্ধি করেছি।

মানুষগুলো একটু দূরে ছিল। তবে আমি ওদের বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম, মানে আমার ঢুলুঢুলু চাউনি মাঝখানের জমিটা ডিঙিয়ে ওদের উপর গিয়ে পড়ছিল। ওদের পিঠের উপর। ওরা এক মস্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি অবিশ্যি আঁচ টের পাইনি, কিন্তু আন্দাজ দেখেছিলাম ওদের শরীরের পাশ বরাবর ঘামের ধারাগুলো রক্তের মতো বইছিল। আমার বিশ্বাস ওরা মুখ ঘুরিয়ে আমাকে শুনতে কষ্ট ভুলত। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কেউ ফেরেনি ওরা যেন আগুনের সঙ্গে আটকে গিয়েছিল।

যেখানে আমি মশগুল ছিলাম সেখানে খাটাশ মেঠো ইঁদুর শেয়ালরা এদিক ওদিক থেকে উঁকি দিচ্ছিল আমি দেখেছি। এমনকি তারা আমার খুব কাছে এসেছিল। তাদের চোখগুলো আগ্রহে চকচক করছিল। এতে আমি অসম্ভব প্রেরণা পেয়েছি। ঐ কানগুলো তৈরি হয়েছে কি হয়নি সেই এক সন্দেহ ছিল। সেটার নিরসন হতে আমি বিশুদ্ধতার চূড়ায় উঠে গেলাম।

শিকার-কথা

আমাদের গাঁয়ে বাঘা-বাঘা শিকারীর বাস। তাঁরা গুলি ক'রে উড়ন্ত পাখি নিচে নামাতে পারেন, তাঁরা মাটিতে দাঁড়িয়ে গোঁফওয়ালা জোয়ানদের মোকাবিলা করতে পারেন। তাঁদের জবানবন্দিতে আমাদের বুক দুরুদুরু হ'ত।

সম্প্রতি কাছেপিঠে বাঘ বেরিয়েছে। ছাগল ভেড়া মানুষজন লোপাট হচ্ছে। ক'টা বাঘ নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না, একটা হতে পারে অথবা আরো বেশি। আমাদের জায়গাটা বনপ্রায় হ'লে নামটা গলা ফুলিয়ে উচ্চারণ করা যেত, তা নয়, নেহাৎ ছাপোষা মফস্বল নাম। তা হোক, আমাদের শিকারীরা আছেন। বাঘটা (একটা ব'লে ধ'রে নেওয়াই ভালো) অবিশ্যি খুব চতুর এবং বলবান। তার কীর্তিকলাপে সে-প্রমাণ যথেষ্ট। তা হোক, আমাদের শিকারীরা আছেন।

তাঁরা বেরিয়েও পড়েছেন। বস্তুত তাঁরা রোজই শিকারে যাচ্ছেন। ফিরে এসে তাঁরা যে-সব গল্প বলেন, তা রীতিমতো রোমহর্ষক। তাঁদের কথার মধ্যে আমরা বাঘের গর্জন শুনতে পাই, জোয়াগুলো আমাদের চোখের সামনে বিদ্যুতের মতো ঝলকে ওঠে। বাঘের ঘুপচি-মেরে-থাকার জায়গাগুলো ক্রমেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। কীভাবে তার মহড়া নেওয়া হয় তা আমাদের মুখস্থ হয়ে এসেছে।

কিন্তু বাঘ মারা পড়ছে না কেন? প্রশ্নটা গেঁয়ো মানুষদের সবার মনেই রয়েছে। আজকের আসরে হঠাৎ সাময়িক ধাক্কায় সেটা ছিটকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কথকদের সে কী বিজ্ঞ হাসি। বললেন, 'মেরে ফেললে তো ল্যাঠা চুকে গেল। তাতে আর মজা কী? আসল মজা হল বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায়।"

ইতিমধ্যে আরো ছাগল ইত্যাদি নিখোঁজ হয়েছে।

ইস্তাহার

ঘড়িটার টিকটিক আমাদের কানে আসে না। জাগিয়ে দেবার মতন শব্দ তা নয়। মাঝখানের যে-ঘর আমাদের মর্যাদাকে ধ'রে রেখেছে, যেখানে জলহস্তীর মতো আসবাবগুলো শুয়ে থাকে, যেখানে ভারী পর্দায় চিৎকার চাপা-দেওয়া, ঘড়ি সেই ঘরে। তার টিকটিক আপন

মনে, যেন হৃৎপিণ্ডের। কিন্তু তার বাজনা শোনা যাবেই, বিশেষত বেলা বারোটা যখন বাজে। একটা দুটো তিনটে ক'রে বারোটা আওয়াজ। একটা বা দুটো বা আরো কয়েকটা তুমি না শুনতে পারো, কিন্তু বারোটায় পৌঁছনোর মধ্যেই তোমার ধ্যান ভেঙে যাবে। এ আমাদের প্রত্যক্ষ জানা। আর এই জন্যেই মনে হয় আমরা চলছি, থেমে নেই। দুপুর থেকে বিকেল এবং সন্ধে এবং রাত্তির এবং সকালের ভিতর দিয়ে আবার দুপুর। একটা দিন। এমনি ক'রে আর একটা দিন। এমনি ক'রে আরো।

কোন্ আমলে ঘড়িটা কেনা হয়েছিল, কেন কেনা হয়েছিল বলতে পারব না। এখন দেখছি ওর কাজটা অবান্তর নয়। ও সময় গুণে গুণে আমাদের জানিয়ে দেয়।

কিন্তু ঘড়িকে মেনে নেওয়ার পর আরেক উপসর্গ দেখা দিয়েছে এবং ইদানীং অনুভব করছি সময়ের হিসেব হলেই ঝঞ্ঝাট মেটে না। ঘড়ি ছাড়াও আরেকটা যন্ত্রের প্রয়োজন বোধ করছি। একটা কম্পাসের। আজকাল মাঝে-মাঝেই আমরা রাতের সমুদ্দুরে পড়ি। খোয়াবের মধ্যেই আমাদের হাড়-মাংসে ঝাঁকুনি লাগে। চারদিকে এক গর্জন শুরু হয়, ঘন ঘন ঝাপ্‌টা এসে পর্দা আর আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করে, এবং এক মিশমিশে আকাশ মাথার উপর ছড়িয়ে যায়। ঘড়ি তো আমাদের জানায় আমরা চলছি। কিন্তু কোন্ দিকে চলছি? উত্তরকে সামনে রেখে, না পেছনে? বাঁয়ে রেখে, না ডাইনে? অথবা, দুপুর থেকে দুপুর যদি একই চক্র হয়, যদি আমরা একই জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে ডুবে যাই। এই এক চিন্তা আজকাল আমাদের পেয়ে বসেছে। অবস্থাটা সঠিক জানা দরকার। কম্পাস ছাড়া এই ঢাউস জাহাজী বাড়িতে আর বেশিদিন টেঁকা যাবে কিনা সন্দেহ।

কর্মসূচী

আরো কত তর্ক হল মনে নেই,
সোজা কথা বোঝা গেল অদৃষ্ট তিলক
অতঃপর চওড়া ক'রে এঁকে নিয়ে
বসতে হবে পোঁতা আছে যেখানে কীলক।

ইয়োরোপ দেখিয়ে কে বলতে চাইল
ওর সাটটা   কিন্তু স্থির হল সাটটা হবে
একসঙ্গে ছেনেছুনে রাতারাতি
তৈরি ক'রে ফেলতে হবে একটি সাদা সং।

অঙ্গ তার যোগ্য উলেই ঢাকতে হবে
কেননা য়ুরোপী সাজা ঠিক্‌লে রোকা চাই ;
দু-পাশে পকেট কিন্তু আবশ্যিক,
মস্ত দুটি, যাদের একটিতে
বড় বড় বুলি থাকবে, অন্যটিতে কেবল টাকাই।

যোগফল

'দুয়ে দুয়ে যে তিন হয়
তারই মোক্ষম প্রমাণ ঝাড়লাম '
'দুয়ে দুয়ে পাঁচ নিশ্চয়
বাপমন্তরে চাপান দিলাম।'

সমালোচকদের এই কাণ্ডবাণ্ড দেখে
বেচারা চার স্ফুট ক'রে
স'রে পড়ল চাঁদে।

তাকে এখন ফিরিয়ে আনবে কে ?
মার্কিন না রুশ ?
না হাজরা মোড়ের ঐ জুতো-ব্রাশ ?

শীতের সকালে

উঁচু একটা পাঁচিল, যেমন জেলখানার হয়। দেখলেই বোঝা যেত বেশ প্রাচীন। কিন্তু তার কোন্ পিঠটা ভিতরের আর কোন্ পিঠটা বাইরের তা আমি বুঝতাম না। আমার সঙ্গীরাও না। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে কথা হত বটে, কিন্তু আমরা পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতাম না।

ছেলেবেলায় শীতের সকালে হিহি করতাম। পাঁচিলটা রোদ আটকাত। তখন আমি মনে মনে এক তীক্ষ জেরার সামনে প'ড়ে যেতাম। কেবল প্রশ্ন। কেন এখানে এই পাঁচিল তোলা হয়েছে, কেন এটাকে কেউ ভাঙছে না· ইত্যাদি। অতশত কেনর উত্তর আমার জানা ছিল না। সেজন্যে এক রকমের কষ্ট হত। তবে আসল কষ্ট ছিল শরীরের। যেখানে তাপ খুঁজছি সেখানে তাপ নেই। আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের পেছনে হটতে হত। একেবারে পেছনে যে-জায়গায় তেরছা একটু রোদ এসে পড়ত। সেটা এক সীমান্ত। তারপরে আর সরা চলে না। তারপরে খাদ। আমরা তারই ধার বরাবর বসতাম। এ তো ভারী অদ্ভুত অবস্থা, আমি ভাবতাম, ও-পাশে পাঁচিল আর এ-পাশে খাদ; তাহলে আমরা আছি কোথায়?

এ-সব অনেককাল আগেকার কথা। ইতিমধ্যে আমার বয়েস অনেক বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে পাঁচিলটাও আরো বুড়ো হয়েছে। যদিও শীতের সকালে আজও আমি রোদ পাই না এবং আমাকে নড়বড়ে শরীর নিয়ে খাদের ধার পর্যন্ত হ'টে যেতে হয়, কিন্তু পাঁচিলটা সম্বন্ধে আমার ছেলেমানুষি আর নেই। আমি এখন তাকে সম্রান্ত ব'লে ভাববার চেষ্টা করি। এটা আমার পক্ষে খুবই সহজ। কারণ আমার ভাববার ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে এবং আমি নিশ্চিন্ত হবার উপায় জেনেছি।

তার কথাগুলো

তার কথাগুলো তগদত হয়ে শুনো
তোমার নেশা লেগে যাবে।
যতই প্রলাপ বকুক
তবু স্নায়ুর উপর তারা অনবরত শব্দ করবে,
মাটি না নড়ুক
তবু ভূমিকম্পের মতো জরুরী শোনাবে।

তারপর আবহাওয়া বদলেই মাতামাতি
তখন বুনো গাছের ঝাড়ে বেপরোয়া শিকার

খাপের বলিহারি খবর
আরো পরে তোলপাড় বাজনা শুরু
অন্দরে অন্দরে চিৎকার:
বাঁচতে চাও যদি এসো
এসো, প্রাগৈতিহাসিক জোয়ারে নেমে নাচো।

বেনামদার রক্তে যখন কথা জমায়
তার অদ্ভুত রগড়—
এই ফুটপাথের ট্রামবাস ঘরবাড়ির সারি
এই হাজার লাখ পায়ে দাগা রাস্তা আর গলি
বেমালুম উবে যায় এবং এক নিরেট ময়দান
হোহো হাসিতে মেতে ওঠে,
লায়েক রাতটা বেজায় জমে
একের পর এক সুখাদ্য শরীর বাহার দেয়,
তাদের নিয়ে এত আহ্লাদ উপচে পড়ে
একবার যদি মন লাগিয়ে শোনো
তুমি তব হয়ে যাবে।

ধস নামার পর

শুনলাম পাহাড়ের গা দিয়ে বরফের ধস নামছিল। এক-চুলের জন্যে বেঁচে-যাওয়া ডজনখানেক লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। তাদের সকলের মুখ থেকেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেলাম। ভয়ঙ্করের বর্ণনায় তারা যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। শুনলেও বুক কাঁপে। মেঘের চেয়েও গম্ভীর আওয়াজ গড়ানো চাঙের, তার মারে হাওয়া ছত্রভঙ্গ হয়, ছুটন্ত কণারা বাষ্পের সমুদ্র ফেনিয়ে তোলে, মানুষ বাড়িঘর প্রচণ্ড চাপে তলিয়ে গিয়ে আরেক পরমাণুতে বদলে যায়। শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল আমি গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি এবং পৃথিবীর কোনো এক স্তরে আবার চাপ বাঁধছি।

যাদের সঙ্গে আমার দেখা হল তারা কেউ বিদেশী বাউণ্ডুলে নয়, তারা আমার জানা লোক। মোটামুটি তাদের আমি ধাপ্পাবাজ মনে করি না,

অন্তত এই ঘটনার বিষয়ে। তাদের বর্ণনায় অতিরঞ্জন যাই থাকুক, বিপদটা যে এসেছিল তা ঠিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধস নামার আগেও আমি তাদের যেমন দেখেছি, পরেও তেমনি দেখলাম। কোনো কিছুতে একটুও হেরফের নেই, হুবহু এক। আমার কাছে এটা এক রহস্য। নিশ্চয় তাদের অভিজ্ঞতার ভিতরে কোনো গূঢ়কথা আছে যা আমি ধরতে পারিনি।

রাত জেগে

কবিতা নয়, চিঠি লিখলাম রাত জেগে।
হৃৎপিণ্ডে রক্ত উজিয়ে নেবার জন্যে
আমাকে প্রায়ই এই রকম জাগতে হয়।
আমার ঘৃণার চেহারা
আমার আশার চেহারা
এখন স্পষ্ট হয়েছে,
তাদের নাম বললে তবে বুকচাপা পাথরটা সরে।
আমি যেমন ক'রে তাদের চিনি
তেমন ক'রে চেনাই,
চোখে ঠুলি এঁটে গোলকধাঁধায় ঢোকা নয়
কিম্বা ধান ভানতে শিবের গীত নয়,
করকরে মূর্তিগুলো সুতোর ডগায় নাচছে
তাদের হুবহু এঁকে দেওয়া
এবং যারা কল্কানির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে
তাদের ডাক দিয়ে প্রতিধ্বনি তোলা।
অতএব চিঠিই আমাকে লিখতে হয়,
যে-কয়টা ঠিকানা আমার মন থেকে একটুও মোছেনি
সেখানে পৌছবে।

চারপাশে পাহাড়ের গোড়ায়
এখন বারুদ ঠাসা
সময় টানটান হয়ে আছে,

এরই মধ্যে অবর মাদারির খেল :
এই শোনো গলায় ফাঁস লাগিয়ে কিলকিলোনো
এই শোনো সোনার ডুগডুগির তালে ছড়াকাটা,
মূর্তিগুলো ঘুরছে ফিরছে
কখনো বুক চিতিয়ে কখনো গ'লে প'ড়ে,
তাদের পিছল ঘোরাফেরায় বাতাস থকথক করে,
আমি তাদের জায়গা ছ'কে ছ'কে নামধাম বলাই।
নিবিষ্ট কোণটার দিকে যারা রয়েছে
আমার বাতির আলো পড়লে তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,
তারা মশাল জ্বালবার আগের মুহূর্তগুলো গুণছে,
আমি এবড়ো-খেবড়ো অক্ষরে
চিৎকার ক'রে তাদের পরিচয় বলি।

ভারসাম্যে

মানুষ ও শস্যের লক্ষণে
আমি আর বিচলিত নই,
আমার ভিত আমি শক্ত ক'রেই গ'ড়ে ফেলেছি।

যখন মাটিতে তুফান দেখা দেয়
এবং যে যেখানে আছে মুখ থুবড়ে পড়ে
যখন খামার আর গোলা তুলোধোনা হয়
এবং কারো মাথা গোঁজার একটা কোণও আর থাকে না,
আমার তা স্বাভাবিক লাগে
আমার দৃষ্টিতে এমন স্থিরতা এসেছে,
আমি মনে মনে
ওটাপড়ার ভারসাম্যে পৌঁছেছি।

ছেলেমেয়েরা যদি মেঘের ছায়া দেখে সিঁটিয়ে ওঠে
কিম্বা বড়দের আঙুল
ধানের শীষ ছুঁয়ে সাপেকাটা নীল হয়,

আমি আর ভাবিত হই না।
ছটফটানি বলো, কুঁকড়ে যাওয়া বলো, চ'লে পড়া বলো
আমি বুঝতে পারি এ-সবই
সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর প্রণালিতে বাঁধা,
এ-সবই ঐক্যতানে লীন হয়ে থাকার জন্যে।

কেউ যখন বলে মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে
আমার হাসি আসে,
শীতলতা যেন তপ্ত নয়!
এই আমি, আমি কি রোদ দেখি না?
কিন্তু আমি যে-কোনো রোদকে
আমার কাচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙিন করি—
আমার হাতের সেই বাহারের কাঁচ।

আসল কথা হল শান্ত হওয়া,
ঠোঁট বন্ধ ক'রেও তা হওয়া যায়
চোখ বন্ধ ক'রেও হওয়া যায়
মাটির উপর চিরদিনের মতো চিৎ বা উপুড় হয়ে তো বটেই।

হিরন্ময় ঢাকনাটি সরিয়ে নেওয়ার পর
কী চমৎকার সরল সত্যের মুখ।

আর এক রকম

একটা কলির গুনগুন শুনতাম
কুয়াশায়,
কে গাইছে ঠিক দেখা যেত না
মনে হত কাছে নৌকো ভিড়েছে
মাঝপথের ঘাটে,
হদিস বোঝা যেত না

কিন্তু সেই গুনগুন বহতার
আমার ভেসে পড়ার টান ছিল।

কুয়াশায় বন্ধু
দূরে পাহাড় তোমারই
আমার শিয়র থেকে স'রে গিয়েছে,
ভীষণ নীল আকাশ।
তবু আর এক রকম ভেলকি জমেছে,
আওয়াজ করবার জন্যে
অন্য কেউ মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
জানলা খুলে দেখতে পাই
তার প্রশিক্ষিত শরীর
এবং তাতে তুফান জাগাবার কায়দা
এবং গলায় এক মুঠো পয়সা ভ'রে
তার বাজানোর খেলা।

ঘরের পৃথিবী

স্বপ্নের কাছে

ছোট ছোট হাতে চোখ রগড়ায়। এবার নাকি ঘুম আসবে। আমি কতক্ষণ ধ'রে একটার পর একটা ঝকঝকে দিন ঘরের মধ্যে সাজিয়েছি। বিছানার উপর শুয়ে প'ড়ে আমি কতক্ষণ ধ'রে চূড়ান্ত মিছিলের রং, রঙের খেলা দেখেছি। ঘুম আসবে? আমি ভাবছি এক চমৎকার রোদ চোখের সামনাসামনি আছে যে-রোদে ধানের মঞ্জরী নাচছে।

গুনগুন গুঞ্জন হয়েছে। বর্গীর অন্ধকারে দশদিক ক্রমে ডুবে যায়। কোনো জলের চূড়ায় বাতি নেই। সমস্তটা সময় কেবল নিশানকে কোনোমতে আগলে রাখা। কিন্তু তারপর কি স্বচ্ছ নীলে মুহুর্মুহু হাসির বিস্ফোরণ নয়? কচি গলায় বড়ো নিশানগুলো দুরন্তভাবে উড়বে না কি?

তাহলে এখন খুবই আসুক। মোচার খোলা টলতে টলতে বাদাল তীরের দিকে চলুক। ছোট্ট মুখটাকে আবার ঘরের কাছে আমি গচ্ছিত রেখেছি।

কথা এখনো ফোটেনি

কথা এখনো ফোটেনি, কেবল শব্দের আবেগ। তা থেকেই বৃত্তের পর দৃশ্য আমার সামনে খুলে যায়। সেতুর উপর হাজার হাজার পায়ের তাল, আলোর ঝলক, তোরণ, একবুক শঙ্খ, নদীর পারে হৈহৈ মেলা। আমি স্ফটিকের গোলকে পৃথিবীর ছায়া দেখি। আমার কানে পোড়ামাটি পার হওয়ার স্বর।

•

আমি যেখানে আছি সে এক বিশ্বাসঘাতক এলাকা। একটা কথাও থিতোয় না, দিনরাত প্রতিধ্বনির তামাশা। যে-সব শব্দ আমি শিখেছি তাদের অর্থ আমার আয়ত্তে নেই। তাদের প্রতিশ্রুতি এক, ব্যবহার আর এক। আমার মুখে ছাইয়ের আস্বাদ।

•

রোজ আমি টলটলে চোখ দুটোর মধ্যে তাকাই। সেখানে যে-ভাষা আছে তা ঠোঁটে এসে পৌঁছবে কি? সে-ভাষা কি ফুল হবে, ফসল হবে? দোসরের ধমনীর রক্ত হবে? আমার ভয়, শব্দগুলো যদি শেষ পর্যন্ত আগুন থেকে আলাদা হতে না পারে। আমি প্রতীক্ষায় টানটান হয়ে আছি।

বন্ধুরা

আমি 'এক-যে-ছিল'র গল্প ফাঁদতে যাই। অমনি মাথা দুলিয়ে 'না' 'না'। এখন বন্ধুরা কোথায়, বন্ধুরা? সেটাই আসল। রাস্তাটা ঢেউ দিয়ে ওঠবার জন্যে থরথর করে। তারা কই? হুঁশিয়ারের কথা শোনা গেছে। সে-ই বুঝি দিনটাকে এমনি ক'রে ছেঁড়েখোঁড়ে, সবাইকে তফাত রাখে। এই জন্যেই তো হাসিটা বারে বারে কান্নার দিকে যায়।

উঠোনে চড়ুই ওড়ে। না ওরা নয়। চাল আর গমের দানা নিয়ে চম্পট দেবার পাখিরা নয়। সেই যে হঠাৎ উড়ে এল, ডানা গুটিয়ে ডালে

বলল, শিস দিল. সেই পাখিটা ? না, না, সে ধান খায়নি। কে তাকে তাড়াল ? সে এলে তবে তো 'বুলবুল' 'বুলবুল' ব'লে হেসে উঠে বন্ধুদের ডাকা যায়।

হাওয়া দেয় আর পাপড়ি খসে ! এখানকার টগরগুলো পোকা-লাগা। ঝিরঝির-খাওয়া চাঁপা। পাপড়ি খসে, অমনি 'ফুল' 'ফুল'। আমি বলি, সোনার ফুল দেব রুপোর ফুল। আবার মাথা দুলিয়ে 'না' 'না'। বন্ধুরা কই, বন্ধুরা ? তারা জানে তাজা-তাজা কুঁড়ি কোথায় ফোটে। রাস্তার ওপারের বনটা রাত্তিরের মতো কালো দেখায়। চোখে জল এসেছে। হাত নেড়ে তবু 'ফুল' ফুল'।

ইঁদুর

এ-সংসারে ঝামেলা বিস্তর। পুরোনো বাড়ি, কোণে কোণে জঞ্জাল। কাজেই এক বস্তি মুঠোর ঝাঁটা ধ'রে ঘুরঘুর। তবু সাফ হয় না। বড়রা অনেক কালের অভ্যেস আঁকড়ে থাকে, খালি জঞ্জাল জমায়। ধুলো ঝুল ঝেঁটিয়ে আনতে আনতে বেরিয়ে পড়ে আরশোলা পিঁপড়ে মাকড়সা। তখন কোমর দুইয়ে একটা পা উঠিয়ে দুমদুম।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে ইঁদুরদের নিয়ে। এ-বাড়িটা মানুষদের না, ইঁদুরদের, সেটাই তো বুঝে ওঠা দায়। তারা খাবারদাবার লোপাট করে, বইপত্তর কাটে। গোড়াতে মনে হয়েছিল তারা এবার পোষ মানবে। ধেড়ে ইঁদুর নেংটি ইঁদুর সবাই নতুন মানুষের কথায় সাড়া দেবে। বড়দের ভাবটা এমন হল যেন তারা একজন জাদুকর পেয়েছে। বোধহয় তারা খেলা দেখাবার কথা ভাবছিল। প্রথম-প্রথম ইঁদুররা বেশ ভালোমানুষের মতো মুখ ক'রে শুনল। তাদের চোখগুলো কিন্তু ধারালো হয়েই ছিল। তবু আশায় আশায় থাকা গেল। তারা শুনল, একটু আধটু ঘাড়ও নাড়ল, তারপর এক দৌড়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। যখন তারা আবার বেরিয়ে এল, তাদের চলাফেরা আরো ধূর্ত হয়েছে, আক্রমণ আরো বেপরোয়া। মানুষগুলোকে তারা যেন উপোসী রেখে মারবে, তাদের মগজ ঝাঁঝরা ক'রে দেবে। সুতরাং আর পোষ মানাবার জন্যে অপেক্ষা করা কাজের কথা নয়। এক বস্তি মুঠোয় এখন লাঠি তুলতে হয়েছে : 'মারো' 'মারো'।

এবার দূরের জন্যে

মা'র পা বাড়ানোটা এবার দূরের জন্যে, সে-কথা মাটিই ব'লে দেয়, সবুজের ছায়াও। অমনি রঙবেরঙের ছবিগুলো দুয়োর, মুখখানা নিবে আসে। ভোর থেকে রাত্তির পর্যন্ত একটা গান ছিল যা শুনতে শুনতে ঘুমোনো, শুনতে শুনতে জাগা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজারবার শোনা। নানান্ পর্দায় একই শব্দের ওঠানামা, আলোআঁধারির বুলা। সেই গানটা মা সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাবে। এঘর ওঘর চলতে ফিরতে ঘুঙুরের মতো বুলা। সেই নাচটা মা সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাবে। চারদিকে অনবরত জল ঝরাবার বাতাস।

কিন্তু মা'র চ'লে যাওয়ার মধ্যে কোনো জাদু আছে। পা এগুতেই ঘরে ফেরার ঢোলক বাজে। গা-শিউরোনো ঝোপগুলো দাউ-দাউ পুড়তে শুরু করে। এক ঝলকানিতে সকালটা দেখা যায়। সেখান থেকে পরিষ্কার গলা এসে পৌঁছয় : বুলা। নিবন্ত মুখখানা অন্য এক দিনের ভিতরে ফোটে। দূরে সরাবার বিশ্রী হাতগুলো সেখানে নেই, গরগরানি নেই। সেখানে হাসিতে টইটম্বুর মা। এখন মোটেই কান্না নয়, কেবল বিভোর হয়ে থাকা।

এরোপ্লেন

এরোপ্লেনের লাল সবুজ
হঠাৎ ফুটে উঠলেই
এক উৎসবের ভেলকি লাগে।
গ্রীষ্মের এক ঝাঁক তারা অমনি যেন আতসবাজি,
কচি আঙুলগুলো
ঘরের দরজা হাট ক'রে দিয়ে
রঙের মধ্যে খেলা করে।
সারাদিন সূর্য যতই ঝলসে থাকুক
তপ্ত গলিতে হাওয়া বইতেই
হাত দুটো ভুবায় ছুঁতে এগোয়
আর জ্বালাপোড়ার ইটপাথর
ভীষণ অন্তরঙ্গ হয়ে

গাঢ় নীলে ভেসে পড়ে,
বাড়িগুলো পাহাড়সবুর টপকে
ক্রমাগত দোল খায়।

এরোপ্লেনের লাল সবুজ
আকাশটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাছে আনে,
তখন পাতলা বাঁশির মতো গলা
সমস্ত দিগন্ত ছাপিয়ে যায়
এবং শেকীন্ড কালিফোর্নিয়ার আলো
অবিরাম শব্দ চালতে থাকে।

দুই বছর

মাটি খুঁড়তে লেগেছিলাম। ঢেউগুলো তখন আরো প্রতারক, তারা নিঃসাড়ে কাটছিল। কুর্ধ নারকেলগাছটা একমাথা মুমূর্ষু রোদ নিয়ে নুয়ে পড়েছিল। যেখানে আমরা আমাদের কাহিনী রেখেছিলাম তার উপর রাতের রাগে আঁকাবাঁকা চিড়। বুলার দুটো বছর সেই জমিটাকে শিকড় দিয়ে শিকড় দিয়ে আশ্চর্যভাবে বেঁধে ফেলেছে।

•

কথাগুলোর একেবারেই ভার নেই। পাতার মর্মরে মিশে যেতে পারে। অথচ তারা কল্লোল নিয়ে আসে। অথচ তারা বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসে। অথচ তারা ফুলফলকে নিঃশ্বাসের কাছে ধ'রে দেয়। পালকের মতো কথা, তার মধ্যে পৃথিবীর নড়াচড়ার শব্দ।

•

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় আবার অন্য ভাষায় যাওয়া ফিরে আসা। খবর বদলে বদলে নতুন সুর। কথার রাজ্যে টলমল করতে করতে যে পা দিয়েছিল সে যেন এক জাদুকরী। কিন্তু সত্যিকার হদিস দেবে গাছেরা অক্ষরা আগুন আর জল। ছোট্ট বুকটা তাদের অভ্রান্তভাবে শুনেছে। সমস্ত ধ্বনি সেখানে হাওয়ার মতো সহজ।

•

কুয়াশার ঋতু গেল, বরফের ঋতু গেল, রোদ্দুর গেল। তবু ঝড়ের কলকাতায় আকাশ ভ'রে আছে। সাত সমুদ্রের তেরো নদী অনবরত পারাপার, কেননা চব্বিশটা ঘণ্টা একনাগাড় বরফের টানে বাঁধা। বরফের মধ্যে কুয়াশার মধ্যে রোদ্দুরটিতে পৃথিবী-জয়ন্তি কয়েকটা মুখ। বুলার চোখে ছবির পর ছবি।

এলাহাবাদ ইস্টিশনের

এলাহাবাদ ইস্টিশনের ঘুমন্ত গোল ঘড়িটা একবার দেখি। না, তার গায়ে কোনো ঢেউ লাগেনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আজকালপরশু আগের বছর। অথচ লাইনগুলো ঝমঝম করে, প্ল্যাটফর্মটা টাল খায়। আমি সমুদ্রের আস্বাদের জন্যে মুখ তুলি। অতল আবেগের মধ্যে যাওয়া, অন্ধকার থেকে মুহূর্তগুলোকে দুরন্ত সোতার দিকে উছলে দেওয়া। পাথরের মেঝের উপর পা সেঁটে আমি তার কতখানি ছোঁয়া পাব? তবু ইস্টিশন পর্যন্ত বুলা আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছে ব'লে আমি বেহুঁশ শহরকে একটু ভুলতে পেরেছি।

সার্চলাইট পড়তে বুলা ঢেউয়ের উপর নাচে। তার কথার রাশ দক্ষিণের হাওয়ায় উড়ে ট্রেন থেমে থাকার সময়টা ভরিয়ে ফেলে। ইঞ্জিনের ভোঁ বাজার আগেই তার দু-চোখের আবিষ্কার শুরু হয়ে যায়। গল্পের জমি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, জীয়নকাঠির খেলা দেখার জন্যে কপাটগুলো হাট হয়ে সকলকে ডাকছে। সীমান্তের লাল বাতি সবুজ হয়েছে, ট্রেন ন'ড়ে ওঠে। তার ঝনৎকার ছাপিয়ে বুলার পায়ের শব্দ কলকাতার কোণে কোণে ছুটে যায়। আমি মগজে পৃথিবীর তোলপাড় নিয়ে দু-ফুট জায়গায় সামনে ঘুরে দাঁড়াই।

ল্যাতাপরা ছেলেমেয়ে

ল্যাতাপরা ছেলেমেয়ে গলির এখানে-ওখানে এসে জড়ো হয় আমার সঙ্গে তারা সোজাসুজি কথা বলতে পারে না, যদিও কথা তাদের বুক ঠেলে আসে। আমাকে দেখে তাদের ঠোঁট একটু খোলে, গোল হয়, ছড়িয়ে যায়। একটা নাম সেখানে পরিষ্কার আঁকা হয়।

কোনো ঝড় ওঠে না, নিঃশ্বাসের বাতাস তাকে জড়িয়ে ধ'রে সমস্ত গলিটা পারাপার করে।

বারান্দা থেকে এখন কেউ আর হাত নাড়ে না। তবু রাস্তার আওয়াজ একবার সামনে এসে একটু থেমে পড়ে। যেন আশার বীজ এখানকার ধুলোতে বোনা হয়েছে। ফটকখোলা বাড়িটা বন্ধুত্বে জাগিয়ে আছে। যে-আগলগুলো প্রথমে ঢেকে থাকত, বুলা তাদের হেসে হেসে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার হাসির টানে মানুষের চোখমুখ কোনো পাঁচিলে আটকা থাকতে পারেনি।

একগাদা ছেলেমেয়ে আতুড়গারে ধুলো মেখে তাদের মিতালিকে কেবলই জিজ্ঞাসায় তুলে ধরে। তারা জানে না, এই ছোট উৎস থেকে বেরিয়ে ভালোবাসা পৃথিবীর চওড়া মোহনায় বিস্তৃত হয়েছে।

——

প রি শি ষ্ট

কবিতার নামসূচি

প্রথম পংক্তির সূচি

কবিতার নামসূচী

প্রথম পংক্তির সূচি

ভুল সংশোধন

১০ পৃষ্ঠায় নেপথ্য কবিতার ৫ম লাইনে 'দূরন্ত' হবে 'দূরান্ত'
৭৩ পৃষ্ঠায় ২য় লাইনে 'উৎসবের' হবে 'উৎসের'
১৪১ পৃষ্ঠায় ৩য় লাইনে 'বুজে, আছে,' হবে 'বুজে আছে,'